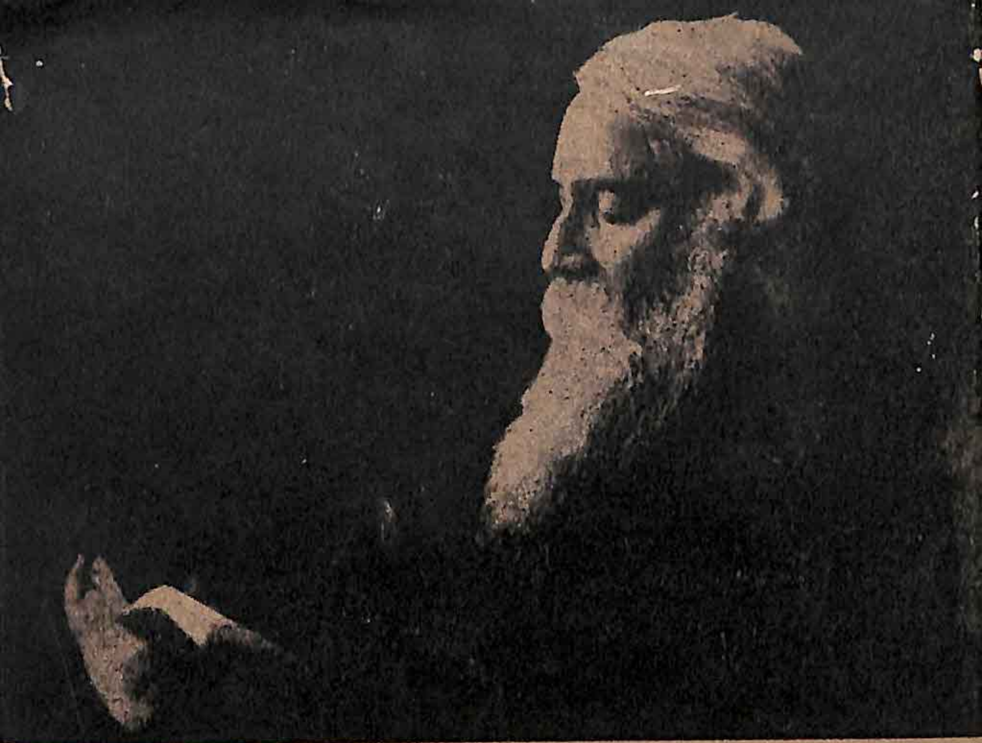


কবি সার্বভৌম

মৈত্রেয়ী দেবী

কবি সার্বভৌম

কবি সার্বভৌম

মৈত্রেয়ী দেবী

প্রথম সংস্করণ ১৩৫৮

মূল্য ঃ তিন টাকা

৯৩।১এ বহুবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা হইতে শ্রীঅমিয়কুমার মুখোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১১নং ওয়েলিংটন স্কোয়ার, কলিকাতাস্থ দি নিউ প্রাইমা প্রেসের পক্ষ হইতে শ্রীঅংশু রায়চৌধুরী কর্তৃক মুদ্রিত।

১১০০—৪—৫১

নিবেদিকা

এই গ্রন্থে একত্রীকৃত প্রবন্ধগুলির বেশীর ভাগই নানা উপলক্ষ্যে নানা অনুষ্ঠানে পঠিত হবার উদ্দেশ্যে লিখিত, সেজন্য এদের মধ্যে একটা ধারাবাহিকতা নেই এবং কোথাও কোথাও পুনরুক্তিদোষও ঘটেছে। নানা সময়ে বন্ধু-বান্ধব ও রবীন্দ্র-গুণগ্রাহী সমধর্মীরা তাঁর সম্বন্ধে আলোচনা শুনতে চেয়েছেন—সেই সেই প্রসঙ্গে আমার সাধ্যমত তাঁর বিচিত্র বহুমুখী প্রতিভার যে প্রতিবিম্ব আমার ক্ষুদ্র হৃদয়ে পড়েছে তা বাইরে প্রকাশ করবার চেষ্টা করেছি এবং চেষ্টা করা মাত্রই বুঝেছি আমার সে প্রয়াস ব্যর্থ হয়েছে।

একথা আজ নিঃসঙ্কোচে সত্যভাষণের খাতিরে বলতে হবে, যে তাঁকে যেমন করে বুঝেছি, তাঁর কাব্য, তাঁর বাণী, তাঁর উপস্থিতি, আমার উপলব্ধিতে যেমন করে প্রবেশ করেছে তা আমার বাক্যের অতীত, এমনকি হয়ত আমার বুদ্ধিরও অতীত। যুক্তি, ব্যাখ্যা, বর্ণনা সমস্তকে উত্তীর্ণ হয়ে আছে সেই অনির্বচনীয়—তাই তৃণ যেমন জ্যোৎস্না ধৌত হয়, আমার মুগ্ধ মন তেমনি নীরবে প্লাবিত হতে চায়। তবুও যখন মাঝে মাঝে সেই উপলব্ধি প্রকাশ করতে চেষ্টা করি তখন ভাষার অকিঞ্চিৎকরতা আমায় পীড়িত লজ্জিত করে।

একদা শ্রদ্ধেয় প্রেমাঙ্কুর আতর্থী মহাশয় আমাকে অনুরোধ করে লিখেছিলেন যেন আমি সিস্টার নিবেদিতার My master as I saw him-এর অনুকরণে একখানা বই লিখি। ঐ নির্দেশ গভীর ভাবে আমার মনকে আকৃষ্ট করেছিল। কিন্তু আমি সে দুঃসাহস করিনি। কারণ জানি সে রকম কিছু লেখবার মত মন এখনও পরিণত হয় নি। তাঁর কাব্য, তাঁর চিন্তা, তাঁর আনন্দ, তাঁর সান্নিধ্য যে অমৃত ঢেলেছে আমাদের অঞ্জলিতে তা ক্রমে ক্রমে দীর্ঘদিনের সাধনা দিয়ে জীবনে গ্রহণ করতে হবে। যা পেয়েছি তা পূর্ণ করে পাওয়া কবে হবে, কবে তাঁর জীবনের সত্য দিয়ে তৈরী হয়ে উঠবে হৃদয় মন তা জানিনে, কবে নিঃসঙ্কোচে বলতে পারব যে, দেখেছি সেই আদিত্যবর্ণ জ্যোতির্ময় স্বরূপকে, দেখেছি আমার জীবনে, দেখেছি আমার কর্মে, দেখেছি আমার আনন্দে, দেখেছি মৃত্যু-বিচ্ছেদের দুঃখ উদ্ভাসিত করে—সেইদিনের আশায় অপেক্ষা করে আছি এবং তার পূর্বে যা কিছু বলবার চেষ্টা করছি জানছি তা বলা হচ্ছে না।

মৈত্রেয়ী দেবী

১, বালিগঞ্জ পার্ক রোড
কলিকাতা।
২।৪।৫১

কবি সার্বভৌম

কবি ও জীবন

কবি কয়েকবার আমাদের ঘরে এসেছিলেন, সেই সময়কার ছিন্ন ডায়েরী প্রকাশিত হবার পর অনেকেই তাঁর সম্বন্ধে আরো লিখতে বলতেন। যদিও মনে জানি বেশীর জন্য আকাঙ্খা স্বল্পের সৌন্দর্য্যকে নষ্ট করতে পারে, আর তা ছাড়া যাঁর কথা সকলে শুনতে চান তাঁকে আমরা কতটুকু জানি? ততটুকুই আমরা তাঁকে জানতে পারি যতটুকু জানবার আমরা যোগ্য। বিশ্ববিজয়ী বিপুল ও বহুমুখী তাঁর প্রতিভার রূপ—সে যেমন তাঁর কাব্যজীবনে তেমনি তাঁর মানব জীবনেও সত্য। যে মানুষ যেমন করে নিতে পারে তাকে তিনি তেমন করেই দিতে পারতেন। একটা আশ্চর্য্য ঘটনা এ। তিনি বলতেন—"মানুষ আপনাকে যা দিতে পারে দেশ কাল পাত্রে তা সীমাবদ্ধ।" সেকথা আমাদের প্রত্যেকের সম্বন্ধেই সত্য। প্রত্যেক মানুষের সঙ্গে সম্বন্ধের একটা বিশেষ রূপ আছে—যেমন করে ঠিক তাকে পাওয়া যায় তেমন করে অন্যকে নয়। সেই জন্যই সঙ্গী নির্ব্বাচনের দিকে আমাদের এত ঝোঁক। শিক্ষা রুচি ও বয়সের নৈকট্য দিয়ে আমরা অনেকটাই চালিত হই—তেমন লোকের

সঙ্গেই ঘনিষ্ঠ হতে ইচ্ছে করে যে অনেকটা আমাদেরই মত। প্রত্যেকটি মানুষই তার শিক্ষা সংস্কৃতি বয়স, দেশ কাল ও প্রকৃতি দিয়ে একটি বিশেষ ভাবে গঠিত জীব। তার ভক্তি ভালবাসা প্রীতি ও বন্ধুত্বেরও তাই একটি বিশেষ রূপ আছে যেটা তার স্বকীয়। সেই তার স্বকীয় বিশেষত্বের সঙ্গেই সম্বন্ধ হয় অন্য মানুষের। তারই সঙ্গে বাধে বিরোধ, তারই সঙ্গে জাগে মিলনের আনন্দ। আপন আপন গণ্ডি দিয়ে ঘেরা সেই যে বিশেষ মানুষটি, তার সেই বিশেষত্বটুকু তিনি অত্যন্ত সহজে স্পর্শ করতে পারতেন। সেইজন্য বহু বিভিন্ন প্রকৃতির ও বয়সের সকল প্রকার মানুষই তাঁর সঙ্গলাভে অসীম সুখ অনুভব করতে পারত। সুদীর্ঘ তাঁর জীবন, ও অভূতপূর্ব্ব প্রতিভাশালী তাঁর মন নানা দেশের নানা মানুষের সঙ্গে যুক্ত হয়ে বিচিত্র অভিজ্ঞতায় চিন্তায় ও ধ্যানে যে একটি আশ্চর্য্যরূপ নিয়েছিল, কোনও একজন সাধারণ লোকের পক্ষে, তা সে যত নিকট থেকেই দেখবার সুযোগ পাক না কেন তার সমগ্রতা উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। তাঁকে সম্পূর্ণ জানা তাই কঠিন। এইজন্য তাঁর জীবন চরিত লেখাও অসম্ভব। তাঁর জীবনের কতগুলি ঘটনা লিখে রাখা যায়, তাঁর মুখের কতগুলি কথা টুকে রাখা যায় কিন্তু তাঁর জীবন আমাদের অগোচরেই থাকবে। তিনি আপনাকে ধরা দিতে পারতেন নানা লোকের কাছে নানা ভাবে। কিন্তু তাঁকে ধরবার সাধ্য কারু ছিল না। আশ্চর্য্য হয়ে অনেক সময় লক্ষ্য করেছি, সনাতনীদের সঙ্গে গল্প করতেন সহজে, আবার অতি

আধুনিক ফিরিঙ্গীয়ানাদের সঙ্গেও গল্প চলত অনায়াসে। যে যেমনটি বুঝতে পারে যার যেমন পরিবেশ, যার যাতে আনন্দ, তিনি যেন অতি সহজে সেইটি অনুভব করে তার সঙ্গে তেমনি ভাবেই মিলতে পারতেন। সেইজন্য তাঁর চারপাশে বহু ভিন্নরুচির মানুষ, যাদের নিজেদের মধ্যে কোনো মিল ছিল না তারাও সমান আকৃষ্ট হ'য়ে একত্র হত। তাঁর পত্র রচনার মধ্যেই আমরা দেখতে পাই কেমন করে বিভিন্ন প্রকৃতির মানুষের সঙ্গে বিচিত্ররূপে তিনি মিলিত হতেন। 'ভানুসিংহের পত্রাবলী' ও 'ছিন্নপত্র' যে একই ব্যক্তির লেখা তা সেই জন্যই বোঝা কঠিন। চিঠিই হোক বা কাব্যই হোক রচনার ভিতর লেখক আপনাকে প্রকাশ করেন, যাঁরা লক্ষ্য তাঁরা উপলক্ষ্য মাত্র। কিন্তু তিনি সেই উপলক্ষ্যকে উপেক্ষা করতেন না, যে যেমন করে রস পাবে তার কাছে তেমনি রসের পাত্রই পৌঁছে দিতেন। তাই যেমন তাঁর পত্র সাহিত্য তেমনি তাঁর জীবনের প্রতিটি দিন বিচিত্র রসে সমৃদ্ধ ছিল। নিজে তিনি প্রায়ই বলতেন যে, "আমার মৃত্যুর পর যদি আমার জন্য কিছু করতে চাও তবে আমার জীবন চরিতাখ্যায়কদের থামিও!" হঠাৎ কেউ মানুষ-রবীন্দ্রনাথ রবীন্দ্রজীবনী বা ঐ জাতীয় কিছু লিখলে তিনি বিচলিত হতেন। বলতেন দেখো, এ চেষ্টা কেন? কেউবা আমার এতটুকু দেখেছেন কেউ বা আর এতটুকু আমার জীবনের কী জানে কে? এই দীর্ঘ জীবনে কত ভেবেছি কত দেখেছি কত উপলব্ধি অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে নানা সংঘাতে গড়ে উঠেছি। কেউবা

তার ছুদিনের খবর রাখে কেউবা চারদিনের। তাই দিয়ে কি আমার মনোবিকলন করবে?

এমন কি তাঁর রাষ্ট্রনৈতিক মত সম্বন্ধেও একটি রচনা উপলক্ষ্যে তিনি লিখেছিলেন "যখন খবর পাই রাষ্ট্রনীতি, সমাজ-নীতি ধর্মনীতি সম্বন্ধে আমার বিশেষ মত কি তা আমার রচনা থেকে কেউ উদ্ধার করবার চেষ্টা করছেন, তখন নিশ্চিত জানি আমার মতের সঙ্গে তাঁর নিজের মত মিশ্রিত হবে। দলিলের সাক্ষ্যের সঙ্গে উকীলের ব্যাখ্যা জড়িত হয়ে যে জিনিষটা দাঁড়ায় তাকে প্রামাণ্য বলে গণ্য করা চলে না। কেননা, অন্য পক্ষের উকীলও সেই একই দলিলকে বিপরীত কথা বলিয়ে থাকেন।"... যখন মতবাদ ও রচনা সম্বন্ধে একথা বলেন তখন জীবন সম্বন্ধে এর প্রয়োগ আরো ব্যাপক। কারণ অংশে অংশে ছোট ছোট ঘটনায় বিচার করতে গেলে মানুষটিকে ধরা যায় না। সমগ্রভাবে অনুভব করে তবে তাঁকে পাওয়া যায়—তাঁর সেই সমগ্রতাকে ধারণা করা বড় কঠিন। সেইজন্য ব্যক্তিগত সম্পর্কে তাঁর কথা কিছু লিখতে গেলে নিজেদের কথাই অনেকখানি এসে পড়ে।

কবি নিজেও মনে করতেন কাব্যর মধ্যে কবির যে রূপ প্রকাশ পায় সেই তার যথার্থ স্বরূপ। সফল কাব্যই কবির সত্য জীবনী। কিন্তু মানুষরূপী তাঁকে ও তাঁর জীবনের ঘটনা ও ব্যক্তিগত প্রকাশকেও দেশ যে এমন আগ্রহভরে দেখতে চায়, পেতে চায় তাঁর মানবিকতার স্পর্শ তা হয়ত তিনি এমন করে জানতেন না।

আমার যখন বার বছর বয়স তখন আমি প্রথম তাঁর নিকটে আসবার সুযোগ লাভ করি। তখন কবি বার্দ্ধক্যের সীমায় দাঁড়িয়েছেন, তবু দীর্ঘ দেহ তখনও নুঁয়ে আসেনি। বলিষ্ঠ পদক্ষেপে তখনও তিনি চলাফেরা করেন, সভাগৃহে উদাত্ত কণ্ঠস্বর উর্দ্ধে চলে যায়। অসুস্থতা, জীর্ণতা তখনও তাঁকে স্পর্শ করতে পারেনি। বেশীর ভাগ সময় শান্তিনিকেতনেই থাকতেন। মাঝে মাঝে কার্যোপলক্ষে কলকাতায় এলে বিচিত্রাগৃহ উৎসবে পাঠে, আলাপে মুখরিত হ'য়ে উঠত। সে আজ প্রায় বিশ বৎসর পূর্বের কথা, আমরা তখন ভবানীপুরে থাকতুম। শ্রদ্ধেয় রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় আমাদের বাড়ির কাছেই টাউণ্ডসেণ্ড্ রোডে একটা বাড়িতে থাকতেন। তিনি প্রায় প্রত্যহই সান্ধ্য ভ্রমণ উপলক্ষ্যে আমাদের বাড়ী আসতেন ও কবির সম্বন্ধে নানা গল্প করতেন। চট্টোপাধ্যায় মহাশয় 'কবি' বলেই উল্লেখ করতেন। রবীন্দ্রনাথ রবিবাবু বা অন্য কিছু বলতে বড় শুনিনি। রোজ সন্ধ্যেবেলা আমাদের দুই অসমবয়স্ক বন্ধুর মধ্যে কবির গল্প হত। প্রথম যখন গোরা উপন্যাসখানি লেখা হয় তখনকার গল্প করতেন। একখানি উপন্যাস সময়মত প্রবাসীর জন্য লিখবেন এই অনুরোধ জানিয়ে অগ্রিম মূল্য পাঠিয়ে দিয়েছিলেন—তাতেই যে এই বৃহৎ অপূর্ব রচনার জন্ম এজন্য সম্পাদকের মনে আনন্দ মিশ্রিত গর্ব ছিল। কবি তখন মাসে মাসে নিজ হাতে কপি ক'রে 'গোরা' পাঠাতেন—তাঁর স্বহস্ত লিখিত সেই পাণ্ডুলিপি হারিয়ে গেছে বলে দুঃখ করতেন।

যখন এই সব পুরাণো দিনের গল্প রামানন্দবাবুর কাছে শুনতাম খুবই ভাল লাগত। কিন্তু তখনও জানতাম না যে প্রবাসীর জন্য লেখা নিয়ে কবির সম্পাদকের দ্বারস্থ হওয়া আমিও শীঘ্রই দেখতে পাব।

সেই সময়ে জোড়াসাঁকোর বাড়িতে কবির কাছে একদিন রামানন্দবাবু বলেছিলেন "রোজ আমাদের আপনার গল্প হয়—মৈত্রেয়ী আপনার গল্প শুনতে খুব ভালবাসে, আর আমাকেও যে একটুকু স্নেহ করে সে আমি আপনার গল্প করি বলে।" কবি সে কথা শুনে স্নিগ্ধ হেসে গভীর স্নেহপূর্ণ দৃষ্টিপাত করলেন। দীর্ঘ ১৭।১৮ বৎসর পার হয়েও বাল্যকালের অস্বচ্ছ কুয়াসা ভেদ করেও সে দৃষ্টি আজও আমার স্মরণ আছে। তাঁর একটি অভ্যাস ছিল। তিনি অধিকাংশ সময়েই কারু দিকে তাকিয়ে কথা বলতেন না। নানা রকম কথাবার্তা আলাপ আলোচনার মধ্যেও দৃশ্যপট ছাড়িয়ে থাকত তাঁর সমুজ্জল দৃষ্টি দূরের দিকে নিবদ্ধ। যা দেখছেন তাকে অতিক্রম করে যেত সে-দেখা, তাই বোধ হয় এত বেশী ক'রে দেখতে পেতেন। ছেলেবেলায় সেজন্য মনে মনে ভারি অভিমান হত। আমার সঙ্গে কথা বলছেন অথচ সে যেন আমার সঙ্গেই নয়। একই সময়ে পারিপার্শ্বিকতার সঙ্গে যুক্ত হয়েও অসীমে মুক্ত সেই আত্মা, একই সময় গভীর মমতাপূর্ণ অথচ নির্মম সেই সন্ন্যাসী চিত্তকে বোঝা তখনকার অভিজ্ঞতায় সম্ভব ছিল না। তাই যখন কোনো বিশেষ কারণে তিনি চোখ ফিরিয়ে তাকাতেন, সে দৃষ্টি স্নেহপূর্ণই হোক,

র্ভৎসনাই হোক বা কৌতুকই হোক মনে তা একটি পুলকিত উত্তপ্ত অনুভূতি নিয়ে আসত। তাই বলছিলুম রামানন্দবাবুর কথা শুনে সেই যে তিনি স্নেহময় হেসে তাকালেন—আজও তা আমার পরিষ্কার মনে আছে।

তার কিছুদিন পূর্বে মহাসমারোহে নূতন মাসিক পত্রিকা 'বিচিত্রা' প্রকাশিত হয়েছে, কবির নূতন রচনা "নটরাজ"কে সঙ্গী করে। তারপর ধারাবাহিক ক্রমে যোগাযোগ প্রকাশিত হচ্ছে বিচিত্রায়। এছাড়াও প্রতিমাসেই থাকছে নূতন নূতন কবিতা। প্রতিদ্বন্দ্বিনীর জন্যই হোক বা যে কারণেই হোক হয়ত তখন প্রবাসীর তহবিলে কিছু ঘাটতি পড়ছে। সেইসময়ে একদিন গ্রীষ্মকালের দুপুর বেলা বাইরে তখন চোখ ঝলসানো রৌদ্র ঝাঁ ঝাঁ করছে—সাড়া পেয়ে উঠে এসে দেখি রামানন্দ বাবুর বাড়ির ভৃত্য দাঁড়িয়ে আছে। সে বল্লে, 'বাইরে রবিবাবু এসেছেন—।' কয়েক মুহূর্ত্ত নিজের কাণকে বিশ্বাস করতে পারিনি। কী আশ্চর্য্য! তাও কি সম্ভব এ কি হতে পারে! এই দুপুরের রোদে এখন হঠাৎ—না না এ অসম্ভব! তবু দ্রুতপদে বাইরে এসে দেখি বারান্দায় দাঁড়িয়ে মৃদু মৃদু হাসছেন।

আনন্দে ও বিস্ময়ে বাড়িসুদ্ধু লোক আত্মহারা! অপ্রত্যাশিত ভাবে এমন অতিথি দ্বারে? তিনি বল্লেন "রামানন্দবাবু অভিমান করেছেন, তাই একটি নূতন লেখা নিয়ে নিজের হাতে তাঁকে দিতে এসেছিলুম। জানতুম তোমরা কাছেই আছ ভাবলুম একবার দেখে যাই।"—আমরা সকলে স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলুম।

তার পূর্বে এবং পরেও অনেকবার দেখেছি, যখন লেখা পাঠাতেন সেই সঙ্গে সম্পাদকের কাছে যে চিঠি থাকত তাতে প্রায়ই লেখা থাকত, "মনোনীত হলে ছাপাবেন" বা ঐ জাতীয় কিছু! লেখা পাঠিয়ে যে অনুগ্রহ করেছেন এমন ভাবতো থাকতই না। একটা পাণ্ডুলিপি প্রবাসীতে প্রেরিত এখন আমার কাছেই রয়েছে তার পিছনে কবি রামমন্দবাবুকে লিখেছন ঃ—শ্রদ্ধাস্পদেষু আমার এই লেখাটি যদি উপযুক্ত মনে করেন তবে প্রবাসীতে ছাপাবেন। ইতি—৮ই নভেম্বর ১৯২৯। আপনাদের শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

এই আশ্চর্য্য বিষয়ের কথা মনে করলে আজকালকার অধিকাংশ লেখকদেরই আকাশস্পর্শী ঔদ্ধত্যের কথা স্মরণ না হয়ে পারে না। একে বিনয় বলব কি না জানি না, এই তাঁর এক আশ্চর্য্য ক্ষমতা জীবনের নানা দিকে, নানা ব্যবহারে বার বার দেখেছি। নিজেকে তিনি তাঁর চারপাশের সাধারণ সকলের সঙ্গে এক ভুমিতে মিলিত করতেন প্রতিভার যে সুদূর উচ্চতা তাকে যেন আমলই দিতেন না।

সেই দিন সন্ধ্যেবেলা শ্রদ্ধেয় রামানন্দ বাবুকে বল্লাম, "সম্পাদকের দরজায় লেখক আজ নিজেই লেখা নিয়ে উপস্থিত, অমনোনীত করে দিন!" খুব খুশী ছিলেন সে দিন সম্পাদক মহাশয়, ঠাট্টা করে বল্লেন,—"কবি বুঝি তোমায় এই কথা বলেছেন?—আমি যদিচ একে বারে অকবি। তবু অমন কথা বলতাম না—বলতাম—তোমাকেই দেখতে এসেছিলাম, লেখার কথাটা উপলক্ষ্য।" যতদূর মনে হয় সেদিন যে লেখাটা

তিনি নিয়ে এসেছিলেন সেটি "শেষের কবিতার" আরম্ভ অংশ, তবে ভুলও হতে পারে।

এই প্রসঙ্গে মনে পড়ছে, কবি গল্প করেছেন, সরলা দেবী তখন ভারতীর সম্পাদিকা আগেই বিজ্ঞাপন ছাপিয়ে দিয়েছিলেন "ভারতীতে রবীন্দ্রনাথের রচিত একটি প্রহসন প্রকাশিত হবে।" তারপর চিঠি লিখলেন—বিজ্ঞাপন ছাপিয়ে দিয়েছি এখন উপায় কি— ! কবি গল্প করেছিলেন আমি লিখলুম তা যখন ছাপিয়েই দিয়েছ তখন উপায় কি লেখাই যাবে! এই হল "চিরকুমার সভার" জন্ম ইতিহাস।

শ্রদ্ধেয় জগদীশচন্দ্র তখন কবিগৃহে অতিথি তাঁর চিত্ত-বিনোদনের জন্য কবি "পণ" "ফেল্" প্রভৃতি অনেক গুলি ছোট ছোট গল্পগুচ্ছের গল্প লেখেন। কবি বলতেন "দুপুরবেলা তিনি (জগদীশ চন্দ্র) খেয়ে দেয়ে ঘুমোতেন আমার উপর হুকুম হোতো ঐ সময়ে একটা গল্প লিখে রাখবে উনি বিকেলে চা খেতে খেতে শুনবেন। করতুমও তাই।"

এমন অপরূপ রসসৃষ্টি এমন সব অদ্ভুত কারণে সুরু হয়েছে। সুধাক্ষরিত তাঁর লেখনীর যেমন বিরাম ছিল না, তেমনি যখন তখন যেমন তেমন আব্দারেও তা অভাবনীয় রসসৃষ্টি করত। আত্মীয় বন্ধু, গণ্যমাণ্য ব্যক্তির অনুরোধও যেমন, অপরিচিত বালক বালিকার অটোগ্রাফের খাতাও প্রায় একই প্রশ্রয় পেত।

যখন তাঁর নানা দিকের নানা ভাবের বিপুল কর্ম প্রয়াসের

কথা ভাবা যায় তখন এই ছোট ছোট ঘটনা-গুলির বিস্ময় মনে ফুরাতে চায় না।

একাধারে কবি, কর্মী স্বুরসাধক শিল্পী কি তিনি নন? বস্তুত কবিত্বের, রসোপলব্ধির মগ্নতার চেয়ে, কর্মের প্রবল প্রেরণাই তাঁর সারাজীবনব্যাপী দেখতে পাই। সে কর্ম্ম ভাবুকের ভাবালুতার দ্বারা আপ্লুত হতে পারেনি। সমস্ত দেশ যখন এক একটি নূতন আবেগে মত্ত হয়ে উঠেছে; স্থির ও সংযত চিত্ত মনিষী তখনও নীরবে তাঁর কর্ম চক্র চালিত করে চলেছেন। যেমন অবস্থাতে যত বিঘ্নই আসুক না কেন তার গতি চঞ্চল হয়নি। "যে কাজ নিজে করতে পারি সে কাজ সমস্তই বাকি ফেলে অন্যের উপর অভিযোগ নিয়ে উত্তেজনার মাত্রা চড়িয়ে দিন কাটানোকে" তিনি রাষ্ট্রীয় কর্তব্য বলে মনে করেন নি। কর্মের এই বিপুল প্রয়াস তাঁর রাজ চিহ্ন লাঞ্ছিত হাতে ভিক্ষাপাত্র তুলে দিয়েছে। তিনি তো কবিতার নীড় বেঁধে দিন কাটান নি। তাই নানা দিক থেকে তাঁর কর্মের স্রোত উর্বর করেছে তাঁর স্বদেশ, —যে দেশ তাঁর চিন্তায় জ্ঞানে নূতন ভাবে জেগে উঠেছে। তবু আশ্চর্য্যের বিষয়, এই যে নানাদিকে বিভিন্নগতি বহুমুখী কর্মোদ্যম চলেছে চিরজীবন ধরে এরই পাশে পাশে একটি শিশু যেন অকারণ আনন্দে আপন খেলায় মেতে আছে। বার্দ্ধক্য তাকে জীর্ণ করতে পারেনা কঠিন প্রতিকূলতায় তার আনন্দ উৎস শীর্ণ করতে পারেনা। বিচিত্রা কবিতায় তিনি যে লিখেছিলেন—, "বারণহীন নাচিত হিয়া কারণ হীন সুখে।"

এ কথা বোধহয় তাঁর শেষ দিন পর্য্যন্ত সত্য ছিল। কোথা থেকে এক স্বত উচ্ছ্বসিত আনন্দধারা হাস্যে কৌতুকে প্লাবিত করে দিত কর্ম্মের কঠিন পথ।

সেটা বোধ হয় ১৯২৯ সাল। কবি দুচার দিনের জন্য কলকাতায় এসেছেন! কাজেই তাঁর প্রতিটি মুহূর্ত্ত নানা কাজে ব্যাপৃত। এক একদিন দু তিনটি করে মিটিং চলেছে। লোকজনের ভীড় তো অহোরাত্র। তার মধ্যে একদিন রবীন্দ্র পরিষদের মিটিং এ প্রেসিডেন্সী কলেজে আসবার কথা। তাঁকে সভায় আনতে যথাসময়ে গাড়ী গেল এবং কতৃপক্ষের নির্দেশ মত আমিও গেলুম সেই সঙ্গে। জোড়াসাঁকোর তিনতলার ঘরে একটা বড় টেবিলের সামনে বসে আছেন। চারপাশে কয়েকজন গণ্যমান্য ভদ্রলোক। আমি গিয়ে একপাশে দাঁড়ালুম। —"কি গো এই অসময়ে? আমি যে এই এখন এদের সঙ্গে বেরুচ্ছি, একটা জরুরী মিটিং আছে। ওঃ হোঃ আজ বুঝি রবীন্দ্র পরিষদে যাব বলেছিলুম! সে তো আর হোলোনা। কী করি বলো? এদের এখানে তো যেতেই হয়। এরা কত আগে থেকে এসে বসে আছেন।" উপস্থিত ব্যক্তিরা সকলেই চুপচাপ। মুখে হয়ত মৃদু-হাসি ছিল কিন্তু সে দেখবার মতো আমার মনের অবস্থা ছিল না। তখুনি সভাস্থল থেকে আসছিলুম সেখানে যে বিরাট জনতা অপেক্ষা করে আছে তার চেহারা মনে পড়ল। আর মনে পড়ল তার কিছুদিন আগে, সাহিত্য সম্মেলনের সভাক্ষেত্রে যে কাণ্ডটা হয়ে গেছে। কবির

উপস্থিত থাকবার ও সভাপতিত্ব করবার কথা ছিল। গিয়েছিলেন পশ্চিমে বিশ্বভারতীর জন্য অর্থ সংগ্রহ করতে—আমেদাবাদে ইনফ্লুয়েঞ্জায় আক্রান্ত হয়ে সময়মত এসে পৌঁছতে পারলেন না সেজন্য সভাক্ষেত্রে কেউ তাকে ক্ষমা করেনি। সেই সময়ে একটা চিঠিতে লিখেছিলেন—"প্রত্যক্ষে ওষুধ খাচ্ছি পরোক্ষে গাল খাচ্ছি এইভাবে আমার শুভ মাঘমাস পার হয়ে গেল।" সে সব কথা আমার মনে পড়ে গেল। আমি মনে মনে ভাবলুম শুধু শুধু যদি উনি মত পরিবর্তন করে থাকেন তাহলে কী কাণ্ডটা হবে। যাঁরা কর্মকর্তা তাঁদের ভ্রূকুটি কটূক্তি মনে করে আমার হৃৎকম্প হল। এমন সময় তিনি হেসে উঠে পড়লেন—"আরে না না দেখছ না কি রকম সেজে গুজে বসে আছি তোমরা নিতে আসবে বলে—খালি মালা চন্দনটা বাকি।"

যত কাজ যত ঝঞ্ঝাট যত ভাবনাই থাকুক না কেন, কিছুই তাঁর উপরে বোঝা হয়ে চাপতে পারত না। কোনো ব্যস্ততা নেই তাড়া নেই এখন একটি অনায়াস ছুটির স্বচ্ছন্দতা নিয়ে তিনি সর্বদা খুশী হয়ে খেলা করে কাজ করতেন। সেইজন্য যে কাজের এক অংশতেও অন্য লোক ভারাক্রান্ত হয়ে হাঁপিয়ে পড়ত তা তাঁকে একটুও ভারগ্রস্ত করতে পারেনি। যা লোহার বস্তা হতে পারত তা তাঁর প্রাণস্পর্শে কুসুম পেলব হয়ে গেছে। এ যে কতদূর আশ্চর্য্য ঘটনা তা তাঁর সম্বন্ধে অভ্যাসবশত আমাদের সব সময় খেয়াল হতো না। তিনি তো ঐ রকমই হাসতে ভালোবাসেন হাসাতে ভালোবাসেন গল্প করতে গল্প শুনতে

ভালোবাসেন—গানে কৌতুকে আমোদে চারিদিক মাতিয়ে তুলতে ভালোবাসেন—কিন্তু কাজগুলো সব হয়ে যায় কী করে? যারা দূর থেকে দেখে বা কাছে আসে বসে গল্প করে চলে যায় তাদের উপর তার ভার স্পর্শ লাগেনা—আজ সেই অতীতের দিকে তাকিয়ে প্রতিটি ছোট ছোট ঘটনাকে যখন দূর থেকে দেখি, তখন সেই দেবপ্রতিম মানব চরিত্রের একটি অপরূপ অখণ্ড মূর্ত্তি মনের সামনে আসে।

তবুও নানা ঘটনা ও রচনা থেকে সংগ্রহ করে এই যে তাঁকে জানবার চেষ্টা এর দায়িত্ব অনেক খানিই আমাদের মনের। কবি জীবনের যে গভীর সমগ্র রূপ তা রইল আমাদের অগোচরে।

"যে আমি স্বপন মূরতি গোপন চারী
যে আমি আমারে বুঝিতে বোঝাতে নারি
আপন গানের কাছেতে আপনি হারি—
সেই আমি কবি কে পারে আমারে ধরিতে?"

—

বিশ্ব মানব

গল্প বলব ?

কাল যা ছিল প্রত্যক্ষ অনুভূতির বিষয় আজ তা স্মৃতির ছবি মাত্র। যাঁর উপস্থিতি এই যুগকে পূর্ণ করেছিল নূতন উপলব্ধি নূতন প্রেরণার আনন্দ সঙ্গীতে, যাঁর উপস্থিতি বন্ধু পরিজন ও ভক্তদের জীবনকে উৎসব রাগিণীর মত মধুর করে রেখেছিল— আজ তাঁর কথা স্মৃতির কেন্দ্রে আশ্রয় নিয়েছে। সেই স্মৃতিতে— যে স্মৃতি সুখ-স্বপ্নের মত আচ্ছন্ন করে রেখেছে হৃদয়, কত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনা গল্পের মত ভেসে ওঠে। সৎসঙ্গে যে সুখ সৎ আলোচনায় তার কিছু মেলে, আর এই ছোট ছোট গল্প কণিকা সেই বিপুল জ্যোতির্লোকের আনন্দ সংবাদ স্ফুলিঙ্গে বহন করে আনে। অথচ তা অনবধানে যত্ন করে সঞ্চয় করে রাখিনি। আজ তারা স্মৃতির দরজায় এসে আঘাত করে এবং সেই ছোট ছোট সামান্য ঘটনার মধ্যেই এক আনন্দময় জ্যোতির্ময় স্বরূপ বলতে থাকেন—অয়ম অহং ভো !

(১)

সে ছিল বোধ হয় ১৯৩৩ সালের গ্রীষ্মকাল। দার্জিলিং-এ 'গ্লেনইডেন' নামে একটি বাড়িতে গুরুদেব অবকাশ যাপনের জন্য এসেছেন। "মালঞ্চ" গল্পটি তখন সদ্য রচনা শেষ হয়েছে। একদিন তাই দার্জিলিং-এ উপস্থিত বন্ধুবান্ধবদের নিমন্ত্রণ এল গল্প শোনবার। কবি পড়ে শোনাবেন মালঞ্চ। বাঁশরী ও মালঞ্চ এ দুটি গল্পই সেবার দার্জিলিং-এ লেখা হয়। বাঁশরীর আগের নাম ছিল "ললাটের লিখন"—তারপর অনেক পরিবর্তন কাঁটাছাঁটা সংযোগ ও বিয়োগ করে আজকের বাঁশরী ও মালঞ্চের রূপ দাঁড়িয়েছে।

সন্ধ্যা হয়ে এল। বসবার ঘরে জনসমাগম হচ্ছে। একে একে সবাই এসে নিজের আসন গ্রহণ করছেন। গুরুদেব ঘরের এক কোণে একটি চৌকিতে বসে আছেন। বাহাত্তর বৎসর বয়স পূর্ণ হয়েছে—তবু দীর্ঘ দেহযষ্টি তখনও তেমন নুয়ে পড়েনি। পাশে একটা ছোট টুলের উপর নীল রংএর খাতাগুলিতে পাণ্ডুলিপি রয়েছে। উল্টে উল্টে দেখছেন ও মাঝে মাঝে সমাগত ব্যক্তিদের সঙ্গে অত্যন্ত নিম্নস্বরে কথা বলছেন। পথে বা সভাস্থলে সর্বদাই তিনি অতি মৃদুস্বরে কথা বলতেন। যখন সভাগৃহে কেহই নিয়মাবর্তী নয়, অর্থাৎ সভারম্ভের পূর্বে বা সভাভঙ্গে সমাগত ব্যক্তিগণের পরস্পর উচ্চৈঃস্বরে কথোপকথন যখন গৃহকে কোলাহল মুখর করেছে, তখনও তাঁকে কোনো

ক্রমেই একটুও জোরে কথা বলতে শুনিনি। অতি মৃদুস্বরে পার্শ্ববর্তীদের সঙ্গে কথা বলতেন। আভিজাত্যের সমস্ত নিয়ম তাঁর স্বভাবের অঙ্গ ছিল। তার কখনো ব্যতিক্রম হতো না।

সভাস্থলে ক্রমে ক্রমে সবাই এসে বসলেন। তাঁদের মধ্যে নানা শ্রেণীর লোক ছিলেন—কারু বা ধনের আভিজাত্য কারু বা মানের, কারু বা দুই আছে। কারু বা দুই এরই অভাব। পরস্পর বিরোধী নানা শ্রেণীর লোক তাঁর নিকটে সর্বদাই একত্র হতেন। সেদিন সেই জনতার মধ্যে একটি অল্প বয়সের মেয়ে ছিল। সেই বিশিষ্ট জনমণ্ডলীর মধ্যে সে নিতান্তই সামান্য এবং লক্ষ্য যোগ্য নয়। কিছুদিন থেকে ইনফ্লুয়েঞ্জায় ভুগছে তবু এ নিমন্ত্রণের লোভ সংবরণ করতে পারে নি, তাই নিজের অসুস্থতা নিয়ে লজ্জিতভাবে একপাশে বসে আছে আর বার বার রুমাল দিয়ে কাশির বেগ রুদ্ধ করছে। পড়া সুরু হয়ে গেল। গম্ভীর স্বাতন্ত্রপূর্ণ আশ্চর্য্য কণ্ঠস্বরে গল্পের যবনিকা উত্তোলন হয়েছে এমন সময় একদল অতিথী এসে পড়লেন। বিলম্বিত অতিথীরা সসঙ্কোচে পিছনে বসে পড়ায় সেই বালিকাকে সামনে এগিয়ে তাঁর দৃষ্টি গোচর হয়ে বসতে হল। কবি তাকিয়ে দেখলেন, সে হাঁটুর উপর মাথা নীচু করে কষ্টে কাশির বেগ নিরুদ্ধ করে পাশের ঘরে উঠে গেল। সেখানে জানালার উপর মাথা রেখে অনেকক্ষণের রুদ্ধ কষ্টের নিবৃত্তি করছে হঠাৎ একটা শব্দ শুনে পিছন ফিরে দেখে কবি সেই ঘরে এসেছেন। টেবিলের কাছে কী যেন খুঁজছেন—। সেটা তাঁর শয়ন

কক্ষ, একপাশে বিছানা আর জানালার কাছে লেখবার টেবিল—তার উপর কাগজ পত্র বই ছড়ান রয়েছে আর রয়েছে সারি সারি বায়োকেমিক ওষুধের শিশি সাজান। বালিকার মনে হল হয়ত তিনি কোনো খাতা ফেলে গিয়ে থাকবেন তাই খুঁজছেন। সে তাড়াতাড়ি এগিয়ে এল—"কী দেব?" "এই যে পেয়েছি; এই নাও।" বলে একটা ওষুধের শিশি খুলে কতগুলি বায়োকেমিক ওষুধের বড়ি একটা কাগজে ঢেলে তার দিকে এগিয়ে দিলেন—"এই নাও দুচারটে করে মাঝে মাঝে মুখে দিলে এখনি কষ্ট কমে যাবে।" বলে তৎক্ষণাৎ ফিরে চলে গেলেন।

স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল বিস্ময়াভিভূত বালিকা। সেই অপস্রিয়মান মূর্তি আজও তার চোখের সামনে আছে। সুদীর্ঘ দেহে দীর্ঘ পরিচ্ছদ আভূমি লম্বিত হয়ে আছে। দুটি হাত পিছনে একত্র করা। একখানি নীল রংএর খাতা আঙুল দিয়ে চিহ্নিত করে ধরে আছেন। ফিরে গিয়েই আসন গ্রহণ করে পড়তে শুরু করলেন।

এই বাধা স্থষ্টির কারণ হয়েছে মনে করে লজ্জিত সংকুচিত হয়ে একপাশে সে বসে রইল। কাণের ভিতর মাথার ভিতর দ্রুত সঞ্চালিত হতে লাগল রক্ত। মনে হল ঘর শুদ্ধ লোক যেন তার দিকে ভ্রূকুটি পূর্ণ ভর্ৎসনা ক্ষেপণ করছে। অবশ্য হয়ত সত্যই কেউ চেয়ে ছিলেন না। কারণ অনেকেই হয়ত ব্যাপারটা বুঝতে পারেন নি আর যদিও কেউ পেরে থাকেন তারাও ততক্ষণে পড়া শুনতে মন দিয়েছেন। তবু তার আনন্দিত অশান্ত

হৃদয় দীর্ঘক্ষণ পর্য্যন্ত ধ্বক ধ্বক করতে লাগল। তারপর কখন মালঞ্চের করুণ গল্প স্রোতের মধ্যে মন ডুবে গেল। অদ্ভুত করুণ রস। শেষ যেখানে আছে "শেমিজ-পরা পাণ্ডুবর্ণ শীর্ণ মূর্ত্তি বিছানা ছেড়ে দাঁড়িয়ে উঠল। অদ্ভুত গলায় বললে পালা পালা পালা এখনই নৈলে দিনে দিনে শেল বিঁধব তোর বুকে শুকিয়ে ফেলব তোর রক্ত।"—মৃত্যুন্মুখ নায়িকার আর্তস্বর এল তাঁর কণ্ঠে সে আজও মনে আছে। কী আশ্চর্য্যই পড়ার শক্তি ছিল তাঁর। সমস্ত রচনা যেন প্রাণ গ্রহণ করে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার মত সজীব হয়ে উঠত।

রাত্রি হয়ে এল। আর্দ্র হৃদয়ে, গল্পের করুণ রসে দ্রবীভূত চিত্তে সবাই বাড়ি ফিরছেন। দীর্ঘ নির্জন ছায়াচ্ছন্ন অন্ধকার—অকল্যাণ্ড রোড দিয়ে মোড় ঘুরে ঘুরে এক একটি দল আলোচনা করতে করতে চলেছেন। সেদিন রাত্রি ছিল পরিষ্কার। সন্থ বর্ষণ শেষ মেঘমুক্ত আকাশে অগণ্য তারা। গল্পের নীরজার দুঃখের কাহিনীকে ছাপিয়ে সেই বালিকার হৃদয়ে এই আশ্চর্য্য স্নেহস্পর্শ অপূর্ব আনন্দে মথিত হয়ে উঠেছিল। সামনের আলোকিত নক্ষত্রখচিত শহরের দৃশ্যের চাইতেও মনের মধ্যে ঝকমক করে উঠছে বিস্ময় ও পুলক। হয়ত তার মধ্যে অহঙ্কারও ছিল। হয়ত সে মনে করেছিল তারি জন্য সভাস্থল থেকে উঠে এসে তাকেই বিশেষ ভাবে তিনি স্নেহ করেছেন। কিন্তু সে অহঙ্কার সত্য নয়। তাঁর হৃদয়ে নিয়ত যে প্রীতি নির্ঝর ঝরতো সে স্বতঃ উৎসারিত ধারা আপন আনন্দে বয়ে গেল! দৈববশতঃ

যাঁরা নিকটে ছিলেন, তাঁরা তাতে অবগাহন করেছেন বটে, কিন্তু সে উপলক্ষ উপলক্ষই মাত্র সমস্ত মানব চিত্তের সঙ্গে প্রেমে নিজেকে মিলিত করাই ছিল তাঁর সাধনা তাই কেউ কোনো কষ্ট পাচ্ছে, তা শারীরিক হোক বা মানসিক হোক এবং সে আত্মীয় হোক বা অনাত্মীয় হোক নিজ অন্তরে তিনি সে বেদনা অনুভব করতেন। বিভিন্ন দেহে বিচ্ছিন্ন হলেও সর্বমানবের মধ্যে পরিব্যাপ্ত মানব সত্তার একটি ঐক্যরূপ ছিল তাঁর ধ্যানে—তাই তুচ্ছ কেউই ছিল না তার কাছে।

(২)

এক পাগল তাঁকে প্রায়ই বড় বড় চিঠি লিখত। পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা কত কি সে লিখত। সে তাঁর অস্তিত্বহীন বিষয় সম্পত্তি বার বার তাঁকে দান পত্র করে দিত। তার সংসারের কাহিনী, দুঃখ সুখ, তার পাগলের প্রলাপ, অসম্বদ্ধভাবে অপরিচ্ছন্ন লেখায় সে প্রায়ই লিখত। সে চিঠি পড়াও যেত না এবং সে সম্বন্ধে করবারও কিছু ছিলনা। পাগলার চিঠি এলে সবাই হাসতেন তারপর ছেঁড়া কাগজের টুকরীতে পড়ে থাকত। কবি মাঝে মাঝে ঠাট্টা করে বলতেন যে এই আমার একমাত্র যথার্থ ভক্ত যে তার সমস্ত সম্পত্তি বার বার আমায় দান করছে। তবে সম্পত্তিটা নিরকার তাই দানটা এত সহজ।

একদিন দুপুরবেলা হঠাৎ ঘরে ঢুকে দেখি সেই পাগলের একটা বিরাট চিঠি হাতে নিয়ে বসে আছেন—"এখন হাতে কিছু

কাজ নেই কিনা তাই এর মনস্তত্ত্বটা বোঝবার চেষ্টা করছি।" সেদিন সেই সূত্রে অনেক কথা বলেছিলেন। সে সব তেমন করে সংগ্রহ নেই। তবু সেদিন বুঝেছিলেম—ঐ পাগলের প্রতি করুণায় তাকে তিনি বাহ্য দৃষ্টিতে দেখে একেবারে বাদ দিতে পারছেন না। যা তাঁর বিপুল কর্ম স্রোতে একেবারে আবর্জনার মত ভেসে যাবার যোগ্য, তাও তিনি ফেলে দিতে পারতেন না। ঘটনা চক্রে কেউ মূর্খ কেউ পাগল, কেউ নির্বোধ—কিন্তু যে আত্মিক লোকে ছিল তাঁর বাস সেই "সর্ব্বমানবচিত্তের মহাদেশে" সকলকেই তিনি স্থান দিতে পারতেন। তাই সেদিন বলেছিলেন "এই যে এর নির্বুদ্ধিতা, এ একটা আকস্মিক ঘটনা। যে মানবলোকের মধ্যে আমি আছি, তুমি আছ, এ পাগলও তারি অন্তর্গত। সঙ্কীর্ণতার বেড়া, তামসিকতার অন্ধকার দিয়ে কারু কারু মন আবৃত কিন্তু তা সত্ত্বেও একটি ব্যাপক সত্ত্বা আছে যা সমস্ত ভেদ অতিক্রম করে। সেই সত্ত্বার অস্তিত্ব আমরা তখনই উপলব্ধি করি যখন অসম্ভব স্থানে অবিশ্বাস্যভাবে হঠাৎ কোনো মহত্ত্বের প্রকাশ দেখতে পাই। মূঢ়ের মূঢ়ত্বই তার চরম সত্য নয়—সেটা তার একটা অস্থায়ী ক্ষণিক প্রকাশ—

(৩)

একদিন খবরের কাগজে প্রকাশিত হয়েছিল একটি ছোট খবর। চীনদেশে জাপানীদের অত্যাচারের ছোট একটি ঘটনা। এক কৃষক পরিবারে স্বামীকে আবদ্ধ রেখে তার সামনে তার

স্ত্রীকে লাঞ্ছিত ও শিশুকে হত্যা করা হয়েছে। বিকেলবেলা সেই ঘটনা কাগজে পড়লেন। তারপর সমস্ত সন্ধ্যা রইলেন নীরবে। সেই গভীর নীরবতার সঙ্গে আর একটি দিনের মাত্র তুলনা—পরে মনে হয়েছিল—যেদিন তাঁর অতি প্রিয় ভ্রাতষ্পুত্র সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মৃত্যু-সংবাদ পান। পরদিন অতি প্রত্যুষে বসেছেন বাইরে চৌকিতে। দৃষ্টি আনত, প্রভাতের প্রথম সূর্য্যালোক পড়েছে তাঁর স্তব্ধ দেহের উপর। নিষ্কম্প স্তব্ধতা। সেই গভীর স্থৈর্য্য, এমন একটি মহিমাপূর্ণ ছিল যা ভাষায় বোঝান কঠিন। সেদিনকার কথা মনে আছে—স্থির বসে আছেন, আর বড় বড় কেন্নুই পোকা হাতের উপর পিঠের উপর যাতায়াত করছে নির্বিঘ্নে! তাতেও ঈষৎ মাত্র সঞ্চালিত হচ্ছে না কোনো অঙ্গ। সেই আশ্চর্য্য হিমালয় সদৃশ অচল স্থির ধ্যাননিবিষ্ট মহাপুরুষের মূর্ত্তি ক্ষুদ্রজনের মনের মধ্যেও বিরাটের উপলব্ধি আনতে পারত।

সেদিন প্রথম যখন কথা বললেন, তখন বললেন—য একঃ স নো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু···মানুষ জানে, যে বুদ্ধি মিলনের ঐক্য সাধনের, সেই শুভবুদ্ধি। তাই মানুষ প্রার্থনা করছে যেন সেই পরম এক শুভ বুদ্ধিতে আমাদের সকলকে এক করে দেন এই মিলনের কল্যাণ ইচ্ছা মানুষের মধ্যেই আছে—আবার সেই মানব চরিত্রেই একি তার বিপরীত।”

সেদিন বেশী কথা বলেন নি। শুধু দেখেছিলাম উপলব্ধির বেদনা। তিনি সর্বদা নিজের যে সাধনার কথা উল্লেখ করতেন, তাঁর কাব্যে ও নানা রচনায়, কখনও তত্ত্বে কখনও গানে ছন্দে

বারবার যে ধর্মকে তিনি "মানুষের ধর্ম" বলে উল্লেখ করেছেন সে ধর্মের সাধনা ঘটে সকল মানবের মধ্যে পরিব্যাপ্ত বিশ্বসত্ত্বার সঙ্গে যোগ সাধনে—"বিশ্ব সাথে যোগে যেথায় বিহারো—সেইখানে যোগ তোমার সাথে আমারো।" নানা স্থানে তিনি বলেছেন যে দেশে কালে বিভিন্ন দেহসীমায় বিভক্ত মানুষের মধ্যেও একটি ঐক্য নিশ্চয় আছে—তা নাহলে জগতে এত আত্ম বিসর্জন এত ত্যাগের কাহিনী আমরা পেতাম না। ভোগ করে তার দেহে কেন্দ্রীভূত ক্ষুদ্রস্বরূপ। কিন্তু ত্যাগ করে সে কার জন্য ? যখন অনাগত সুদূর ভবিষ্যতের কল্যাণ কামনায় অনায়াসে প্রাণ বিসর্জন করে তখন দেখি মানুষের বিশ্বরূপকে। মানুষের মধ্যে এই বোধ নিশ্চয় আছে যে তার ক্ষুদ্র স্বরূপ তার একমাত্র সত্য নয়। তাই তিনি বলেছেন "যে মানুষ আপনার আত্মার মধ্যে অন্যের আত্মাকে ও অন্যের আত্মার মধ্যে আপনার আত্মাকে জানে সেই জানে সত্যকে।"

জীবনে কত ছোট ছোট ঘটনায় কবির এই সত্য সাধনার অন্তর্রূপ বাহিরে প্রতিবিম্বিত হত তার কতটুকুই বা লক্ষ্য করবার শক্তি এবং সুযোগ আমাদের হাতে ছিল ? তবে সেদিন এই চীনা পরিবারের দুঃখের বেদনা যখন আত্মীয় বিয়োগের মতই আঘাত হানতে দেখলুম, তখন মনে হয়েছিল এ সেই "বড় আমি"র রূপ এ সেই বিশ্বসত্তা এ সেই অন্তসীমায় আবির্ভূত অনন্ত। অথচ ব্যক্তিগত দুঃখ কষ্ট কখনো অতিকায় হয়ে উঠত না। ব্যক্তিগত শোকে তিনি অধৈর্য্য হতেন না। কারণ দূরের

মধ্যে পরের মধ্যে প্রসারিত তাঁর চৈতন্যে ব্যক্তিগত দুঃখের ভার হাল্কা হয়ে যেত। তাকে প্রাধান্য দিতে কখনই চাইতেন না।
"বিশ্বজগত আমারে মাগিলে কে মোর আত্মপর?"

আজ যখন তাঁরই জন্মভূমিতে ভ্রাতৃহত্যায় নিরত অবিশ্রাম হননের কাহিনী—মনকে কঠিন ও শ্রবণকে পঙ্কিল করে তুলেছে তখন মনে হয় ব্যর্থ কি হয়েছে এদেশে তাঁর আবির্ভাব?

তিন ভঙ্গী

রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত জীবন সম্বন্ধে বলতে বলা হয়েছে হাতে সময় অল্প! তাঁর সম্বন্ধে কিছু বলতে গেলে বা লিখতে গেলে মনে হয় যেন এক অনন্ত সমুদ্র তীরে বসে আছি, এর কোথায় আদি কোথায় অন্ত! কোনখান থেকে অঞ্জলী তুলব? তাছাড়া যেমন সীমাহীন সমুদ্রের দিগন্তে যখন সূর্য্যোদয় হয় তখন সামনের অনন্ত জলরাশি উত্তীর্ণ হয়ে সূর্য্যের দিকেই দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়ে পড়ে। তেমনি তাঁর বিস্তীর্ণ কর্মক্ষেত্রকে ছাপিয়ে কেবলি তাঁর সেই অনির্বচনীয় ব্যক্তিস্বরূপ লৌকিক দেহের মধ্যে লোকত্তর কান্তিময় মানুষ রূপটি বারবার মনের সামনে এসে দাঁড়ায়। কিন্তু সে কথা আলোচনার উপযুক্ত পরিবেশ চাই, সভা বা যন্ত্র তার যোগ্য আবেষ্টন নয়।

একথা নিশ্চয় সত্য যে যাঁরা তাঁকে নিকট থেকে দেখবার সুযোগ পেয়েছেন তাঁদের মনে তাঁর কাব্য থেকে তাঁর ব্যক্তিগত রূপকে আলাদা করে দেখবার উপায় নেই। তোমার কীর্ত্তির চেয়ে তুমি যে মহৎ একথা বলি বা না বলি, তাঁর কাব্য আর জীবনে যে, কোনো পার্থক্যই নেই রবীন্দ্রকাব্য যে রবীন্দ্রজীবনেরই প্রতিচ্ছবি একথা বারবার মনে হতে থাকে। আমরা জানি তিনি নিজের জীবনী লেখেন নি এবং ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিগত জীবনী

লেখবার উপাদানও রেখে যান নি। বস্তুত তাঁর জীবন নিয়ে, ব্যক্তিগত সুখ দুঃখ নিয়ে, কেউ টানা হেঁচড়া করে প্রকাশ্য রাজপথে নিয়ে আসবে এ তিনি ইচ্ছাই করতেন না। প্রথমত তিনি মনে করতেন উপাদান পেলেই জীবনী রচনা সম্ভব নয়— ঘটনা দিয়ে কবিকে কে বুঝবে? সুদীর্ঘ জীবনে কত ঘাত প্রতিঘাতের ভিতর দিয়ে উত্তীর্ণ হ'তে হ'তে এসেছেন তাঁর সূক্ষ্ম অনুভূতিশীল মনের কত তন্ত্রীতে কত রাগিনী বেজেছে, কত তুচ্ছ ঘটনায় কত বৃহৎ উপলব্ধির সূচনা হয়েছে আপাত দৃষ্টিতে কত বৃহৎ ঘটনা প্রতিহত হয়েছে, সেই ভিতরের মানুষটিকে বাহ্য ঘটনাবলী সংগ্রহ করে স্পর্শ করা যায় না। তাঁকে জানবার একমাত্র উপায় সেই পথে যে পথে, তাঁর বিচিত্র আত্মপ্রকাশ সুরে ছন্দে গানে লীলায়িত। তাই তিনি বলেছেন সফল কাব্যই কবির জীবনী।

বাহির হইতে দেখনা এমন ক'রে
দেখনা আমায় বাহিরে—
আমার বেদনা খুঁজোনা আমার বুকে
আমায় দেখিতে পাবেনা আমার মুখে
কবিরে খুঁজিছ যেথায় সেথা সে নাহিরে!

*   *   *

যে গন্ধ কাঁপে ফুলের বুকের কাছে
ভোরের আলোকে যে গান ঘুমায়ে আছে
শারদধান্যে যে আভা আভাসে নাচে

কিরণে কিরণে হসিত হিরণে হরিতে—
সেই গন্ধই গড়েছে আমার কায়া
সে গান আমাতে রচেছে নূতন মায়া
সে আভা আমার নয়নে ফেলেছে ছায়া
আমার মাঝারে কে পারে আমারে ধরিতে।

* * *

নবীন উষার তরুণ অরুণে থাকি
গগনের কোণে মেলি পুলকিত আঁখি
নীরব প্রদোষে করুণ কিরণে ঢাকি
থাকি মানবের হৃদয় চূড়ায় লাগিয়া।

* * *

যে আমি স্বপন মূরতী গোপন চারী
যে আমি আমারে বুঝিতে বোঝাতে নারি
আপন গানের কাছেতে আপনি হারি
সেই আমি কবি কে পারে আমারে ধরিতে।

সেই স্বপন মূরতী গোপনচারী কবি নিজেকে প্রকাশ করেছেন অসংখ্যভাবে—তাঁর চিত্তের সুকুমার ললিতভঙ্গী কত ছন্দে কত সুরে উদ্বেলিত হ'য়ে উঠল। তার মধ্যে এই কবিতাটি একটি মূল প্রধান সত্যকে প্রকাশ করেছে। সংক্ষেপে এই কবিতাটি তাঁর জীবন কাহিনী বলা চলে। এর মধ্যে যে তিনটি প্রধান বক্তব্য বলা হয়েছে সেগুলি অবলম্বন করে দু একটি কথা বলে আমার এ ক্ষুদ্র প্রবন্ধ শেষ করব।

কবি কোথায় আছেন? কোথায় নিজেকে প্রসারিত করেছেন আনন্দে? প্রকৃতির সৌন্দর্য্যের মধ্যে এক হয়ে ফুলের বুকে গন্ধ যেমন লীন হয়ে থাকে তেমনি তিনি আছেন বিশ্ব সৌন্দর্য্যের আনন্দলীলায় একাকার হয়ে। ভোরের আলোর গান, শারদ ধান্যের আভা—হরিত ও হিরণের লীলা, তার মধ্যে সৃষ্টি করছে আশ্চর্য্য মায়া—কবি প্রবেশ করছেন বিশ্ব সৌন্দর্য্যের অন্তরে। আর কোথায় আছেন?

—থাকি মানবের হৃদয় চূড়ায় লাগিয়া—

মানুষের সুখ দুঃখের সঙ্গে একাত্মচিত্ত কবি কল্পনার নীড় বেঁধে দিন কাটান নি। সংসার ও সমাজের বিচিত্র সুখ দুঃখ বিপুল আবেগে তাঁর হৃদয়ে আঘাত করেছে। তাকে তিনি কাব্যে গল্পে প্রবন্ধে ব্যক্ত করেই ক্ষান্ত হন নি নেমে এসেছেন সেই প্রত্যহের ধূলিজালখিন্ন মানব সমাজের আবর্তের মাঝে নানা তুচ্ছ কাজে অসীম অধ্যবসায় নিয়ে। জগতের ইতিহাসে এমন ঘটনা বিরল যে, যে কবি লিখেছেন এই সব মূঢ় ম্লান মূক মুখে দিতে হবে ভাষা, তিনিই ভাষা দেবার জন্য স্কুল খুলে বসেছেন। শুধু যে মানুষের ব্যক্তিগত সুখ দুঃখ মিলন বিরহ, আনন্দোচ্ছ্বাস ও বেদনাবিকীর্ণ-চিত্তসন্তাপ তাঁর অনুভূতিতে প্রবেশ করে গীতি কবিতা হয়ে উঠল—

তোমাদের চোখে আঁখিজল ঝরে যবে
আমি তাহাদের বেঁধে দিই গীত রবে
লাজুক হৃদয় যে কথাটি নাহি কবে—
লুকাইয়া কহি তাহারে—

শুধু তাই নয়, প্রত্যহের হৃদয়াবেগকে চিরকালের আনন্দের উৎস করে রাখা—

প্রেয়সী নারীর নয়নে অধরে
আর একটু মধু দিয়ে যাব ভ'রে

আর একটু হাসি শিশু মুখ পরে শিশিরের মত রবে—

শুধু তাও নয়—শুধু গীতি কবিতা নয়—শুধু আনন্দলীলা নয়—জীবনের যে বিপুল বিচিত্র প্রকাশ—প্রত্যহের রূঢ়তায়, কর্তব্যের বন্ধুর পথে, তারি মধ্যে তিনি ছুটিয়ে দিলেন রথ সম্মুখের দিকে নূতন উৎসাহে নব নব কর্মে। তাঁর মজ্জমান দেশের চিত্তকে প্রসারিত করে দিতে চাইলেন নূতন যুগের আলোতে। "আমরা চলি সমুখ পানে কে আমাদের বাঁধবে। রইল যারা পিছুর টানে কাঁদবে ওরা কাঁদবে। মন ছড়াল আকাশ ব্যাপে আলোর নেশায় গেছি ক্ষেপে। ওরা আছে দুয়ার ঝেঁপে চক্ষু ওদের ধাঁধবে।" সেই রুদ্ধ দুয়ার খুলবার জন্য তাঁর আবেগ কম্পিত হৃদয়ের ঘন ঘন করাঘাত পড়েছে তাঁর দেশবাসীর হৃদয়ে।

লাঞ্ছিতের লাঞ্ছনা শুধু সঙ্গীতে উৎসারিত নয়, জীবনের মধ্যে অনুভব ক'রে কর্মের দ্বারা দূর করতে চেষ্টা করেছেন। প্রকৃতির ও মানব প্রকৃতির সমস্ত বিচিত্র সৌন্দর্য্য ও ভাবের সঙ্গে পূর্ণ একাত্মতায় নিজেকে উপলব্ধি করেছেন। তাই বিশ্বে ব্যাপ্ত হয়েছে তাঁর সত্ত্বা।

"ইচ্ছা করে মনে মনে
স্বজাতি হইয়া থাকি সর্বলোক সনে
দেশে দেশান্তরে।......
সকলের ঘরে ঘরে
জন্ম লাভ করে লই হেন ইচ্ছা করে—

* * *

চতুর্দিক হতে মোরে লবে নাকি টানি
এই সব তরুলতা গিরি নদী বন
এই চির দিবসের সুনীল গগন
এ জীবন পরিপূর্ণ উদার সমীর
জাগরণ পূর্ণ আলো, সমস্ত প্রাণীর
অন্তরে অন্তরে গাঁথা মানব সমাজ !

বিশ্বভুবনের সঙ্গে সমস্ত মানবের সঙ্গে এই যে গভীর একাত্মতার বোধ এ শুধু মাত্র কাব্য কাহিনী নয়—এ তাঁর ধর্ম জীবনেও সত্য। ধর্ম জীবন বলতে কি বোঝায় সে কথা এখানে সংক্ষেপে বলব। প্রথমে যে কবিতাটি নিয়ে আরম্ভ করেছি সেই কবিতাটির মধ্যে প্রধান যে তিনটি ভাবের কথা বলা হয়েছে তার মধ্যে এই তৃতীয় কথাটিও সংক্ষেপে আছে।

প্রকৃতি ও মানব হৃদয় এই দুইকে অবলম্বন করে যে 'গোপনচারী' কবির স্বপন মূরতী তাকে কথায় ব্যাখ্যায় কে ধরবে ? এবং আরো ধরা যাবেনা কবির সেই অন্তরগত মূর্তি

যা মানুষ আকারে বদ্ধ নয়।—"মানুষ আকারে বদ্ধ যে জন ঘরে যাহারে কাঁপায় স্তুতিনিন্দার জ্বরে"—তার মধ্যে কবি তো সম্পূর্ণ নয়—তাঁর চিত্ত জগৎ সেই ক্ষুদ্র সীমাকে উত্তীর্ণ হয়ে আছে—এই কথা তিনি মানুষের ধর্ম, আমার ধর্ম প্রভৃতি প্রবন্ধে বিশেষ করে বুঝিয়েছেন। তিনি অনুভব করেছেন মানুষের দুটি রূপ আছে একটি তার বিশেষ রূপ, আর একটি তার বিশ্বরূপ। সেই বিশ্বরূপে সে সমস্ত মানব চিত্তের সঙ্গে যুক্ত—সে বাস করে সর্ব মানব চিত্তের মহাদেশে। এই কথা সংক্ষেপে বলবার মত নয় তবু মানুষের ধর্ম থেকে উদ্ধৃত করে সামান্য একটু বলবার চেষ্টা করব কারণ তাঁর জীবন বৃত্তান্তের বৃহত্তম ঘটনাগুলি এই বিশ্বমানবের মানসলোকে ঘটেছে। "মানুষ আছে তার দুইভাবকে নিয়ে একটা তার জীবভাব আর একটা বিশ্বভাব। জীব আছে আপন উপস্থিতকে আঁকড়ে, জীব চলেছে আশু প্রয়োজনের কেন্দ্রকে প্রদক্ষিণ করে—মানুষের মধ্যে সেই জীবকে পেরিয়ে গেছে যে সত্ত্বা সে আছে আদর্শকে নিয়ে। এই আদর্শ অন্নের মত নয়—বস্ত্রের মত নয় এই আদর্শ একটা আন্তরিক আহ্বান—একটা নিগূঢ় নির্দেশ। কোন দিকে নির্দেশ? যে দিকে সে বিচ্ছিন্ন নয় যে দিকে তার পূর্ণতা—যে দিকে সে ব্যক্তিগত সীমাকে ছাড়িয়ে চলেছে যে দিকে বিশ্ব মানব।"—তিনি বলেন এই যে ব্যক্তিগত মানবের মধ্যে বিশ্বগত মানবের অভিব্যক্তি—এরই ফলে জগতে ত্যাগ, আত্মবিসর্জন সৌন্দর্য্য ও শ্রেয়োবোধের জন্ম। মানুষ যখন অনায়াসে প্রাণ দেয়, নিজের জৈবিক সীমাকে অতিক্রম

করে, এমন সব কঠিন আত্মপীড়নে প্রবৃত্ত হয় জীববুদ্ধি দিয়ে যাঁর ব্যাখ্যা হয় না। সে কি ক'রে যা ভালো যা সুন্দর যা শ্রেষ্ঠ তাকে লাভ করবার জন্য কষ্ট সাধ্য সাধনায় প্রবৃত্ত হয়? সে যে শুধু সমাজ রক্ষার জন্য তা নয় সে আপন আত্মার, মানবতার, পরিপূর্ণতা লাভের জন্য। মানুষের মধ্যে দুই আমির এই দোলা রবীন্দ্র সাহিত্যের একটি মূল কথা। "আমি বলেছি আমাদের মধ্যে একদিক অহং আর একদিক আত্মা। অহং যেন খণ্ডাকাশ ঘরের মধ্যকার আকাশ—যা নিয়ে বিষয় কর্ম মামলা মকদ্দমা এই সব। সেই আকাশের সঙ্গে যুক্ত মহাকাশ তা নিয়ে বৈষয়িকতা নেই—সেই আকাশ অসীম বিশ্বব্যাপী। আমার মধ্যে দুটো দিক আছে একটা আমাতেই বদ্ধ আর একটা সর্বত্র ব্যাপ্ত। এই দুইটি মিলিয়ে মানবের পরিপূর্ণ সত্ত্বা।"

সীমার মধ্যে অসীমের এই লীলা রবীন্দ্র সাহিত্যের চরম সংবাদ। এই লীলায় লীলায়িত কবির জীবন। তিনি দেখেছিলেন বিশ্বস্থূল নয়। বিশ্বে এমন কোনো বস্তু নেই যার মধ্যে রসস্পর্শ নেই—তাঁর উপলব্ধি ও ধ্যানমননে বিশেষ মানব তার বদ্ধ সত্ত্বাকে পার হয়ে সেই 'বড়ো আমি'র স্পর্শ লাভ করেছিল বটে কিন্তু তার বিশেষ রূপকে লুপ্ত করে নয়।

প্রকৃতির সৌন্দর্য্য লীলা এবং ছোট বড় নানা সুখ দুঃখে আন্দোলিত মানব চিত্তের কোনো কিছুই তিনি ছেঁটে ফেলতে চান নি। কারণ "মানুষকে বিলুপ্ত করেই যদি মানুষের মুক্তি—

তবে মানুষ হলাম কেন ?" মানব হৃদয়ের লীলা চাঞ্চল্য আনন্দ আবেগ সবেরই মূল্য আছে—বিশেষ যে, তাকে অবলম্বন করেই জাগছে নির্বিশেষ। এই সমস্তকে জড়িয়ে নিজের জীবনকে জীবন দেবতার প্রকাশ রূপে যে দেখা এই বিচিত্র দেখবার শক্তিতেই ঘটেছে রূপের সঙ্গে অরূপের সমন্বয়—দেহর মধ্যে থেকেও দেহ অতিক্রমণের ক্ষমতা।

গভীর অনুভূতির সাহায্যে বিশ্বপ্রকৃতি জীব প্রকৃতি ও বিশ্বব্যাপ্ত মানবত্মা এই তিনে মিলে যাঁকে সৃষ্টি করেছিল কথায়, ঘটনায়, ব্যাখ্যায় সে ধরা দেবে না—সে আছে গানে, ছন্দে, সে আছে মানবের হৃদয় চূড়ায় লাগিয়া। কারণ কী প্রকৃতির সঙ্গে যোগে কি মানব হৃদয়ের সংস্পর্শে তাঁর যাত্রাপথে যা এসেছে সবই তাঁর আনন্দ রসে জীর্ণ হয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে সেই ক্ষেত্রে যেখানে বস্তু তার বস্তুত্বের বন্ধন ছিন্ন করে পেয়েছে রসের অসীমতা—দেহ লাভ করেছে দেহের অতীতকে—সমস্ত সুখ দুঃখের ভিতর দিয়ে স্পর্শ করেছেন এমন অনির্বচনীয়কে—"শুধু কেবল গানেই ভাষা যার, পুষ্পিত ফাল্গুনের ছন্দে গন্ধে একাকার"। প্রকৃতির ভাববাসা তাই তাঁকে এনেছে "স্বর্গের কাছাকাছি" জীবন যাত্রা হয়েছে তীর্থযাত্রা—

২৫শে মাঘ, ১৩৫০

শান্তিনিকেতনে

আপনারা যেখানে আছেন এখানে আমার পক্ষে গুরুদেব সম্বন্ধে কোনও নূতন কথা শোনাতে যাওয়া ধৃষ্টতা, তাঁকে অনুভব করবার তাঁকে জানবার উপায় এখানে চারপাশেই ছড়িয়ে রয়েছে। গুরুদেবের মৃত্যুর পর এই প্রথম আমি শান্তিনিকেতনে এলাম। আসতে আসতে বারবার সেই সব দিনের কথা মনে পড়ছিল যখন আমরা নম্রহৃদয়ে শিক্ষার্থী হ'য়ে এই তীর্থক্ষেত্রে তাঁর পায়ের কাছে আসতুম। তখনও শান্তিনিকেতন এমন পূর্ণতা পায় নি। তবু সহরের নানা আবর্জনা ও জটিলতা থেকে যখন বহু চেষ্টায় মাঝে মাঝে এই পরিচ্ছন্ন শান্তির মাঝখানে মহাপুরুষের কাছে পৌঁছতে পারতাম তখন সেই বিরাট প্রতিভার একটী যে প্রবল আকর্ষণী শক্তি আমরা অনুভব করেছি সেই অনুভূতি আজ কেউ ব্যাখ্যা করে বোঝাতে পারবে না। ফুলের গন্ধকে যেমন বক্তৃতা করে বোঝান যায় না, তেমনি তিনি যে কেমন ছিলেন, তাঁর অনুভূতি তাঁর ব্যক্তিত্বের স্পর্শ কেমন ভাবে মানুষের মনকে অনুভাবিত করত তা যাঁরা অনুভব করেননি তাঁদের পক্ষে কল্পনা করাই শক্ত হবে।

গুরুদেব একজনের মধ্যে বহু ছিলেন—সে যে শুধু দীর্ঘ জীবনের বহুত্ব তা নয়, সে বৈচিত্র্য তাঁর প্রকৃতির। সেজন্য যে মানুষ যেমন তার সঙ্গে তেমনি হয়েই মিলিত হতে পারতেন। তাঁর যেটি বিরাট এবং পূর্ণ স্বরূপ, আমাদের বুদ্ধি অভিজ্ঞতা এবং

উপলব্ধিতে তার যথার্থ অনুভব হওয়া সম্ভব নয়। তিনি যে কেমন ছিলেন তার সম্পূর্ণটা আমরা জানতে পারি না। কিন্তু তবু আমাদের প্রত্যেকের কাছে তিনি আমাদের মতই হ'য়ে এসেছিলেন। যখন মংপুতে আমাদের নিতান্ত দরিদ্র ব্যবস্থার মধ্যে তিনি যেতেন তখন আমার প্রায়ই সেই লাইনটা মনে পড়ত—"তব সিংহাসনের আসন হতে এলে তুমি নেমে, মোর বিজন ঘরের দ্বারের পাশে দাঁড়ালে নাথ থেমে।" বস্তুত নামতে তাঁকে হোতো, কারণ বুদ্ধি বিদ্যা শক্তি ও প্রতিভার যে সুদূর ঊর্দ্ধলোকে তিনি আবির্ভূত হয়েছিলেন, কেউ কি তার নাগাল পেত যদিনা স্নেহে প্রেমে করুণায় সর্বদা তিনি তাঁদের সঙ্গে মিলিত হতেন যাঁরা অনেক নিম্নে। মানুষের নানা অক্ষমতা তিনি জানতেন ক্ষুদ্রতাও তিনি বুঝতেন কিন্তু সেইটাই তিনি চরম সত্য বলে ধরতেন না। প্রতি মানুষের মধ্যে যেটুকু বিশেষত্ব, যেটুকু গুণ যেটুকু মাধুর্য্য আছে, তাই তিনি বড় ক'রে দেখতেন। হয়ত সেজন্য অনেক সময় তাঁর কাছে বাস্তব মানুষের রূপ যেত বদলে, কিন্তু সে যে শুধু তাঁর কল্পনার খেয়ালে তা নয়—তিনি জানতেন যে, যত ক্ষুদ্র বুদ্ধি যত সংকীর্ণতাই আসুক না কেন ভিতরের মানুষটি সর্বদাই তার চেয়ে বড়। সেইজন্য আপাত দৃষ্টিতে অনেক বৈষম্যর ভিতরেও তিনি সমতা খুঁজে পেতেন। এখানে তাঁরই আবেষ্টনের মধ্যে বসে তাঁর সম্বন্ধে বেশী কথা বলতে যাওয়া প্রগল্‌ভতার মত শোনায় বলে আমাদের স্বভাবতই সংকোচ বোধ হয়, কিন্তু এটা ঠিক যে অতি পরিচয়ে অভ্যস্ত হ'য়ে এলে যা

আশ্চর্য্য তা আর তত আশ্চর্য্য ঠেকে না। আমরা যারা দূরে থাকতুম, অন্য আবেষ্টনে সহরের নানা জটিলতার মধ্যে থাকতুম এবং মাঝে মাঝে তাঁর নিকটে আসবার পরম সৌভাগ্য লাভ করতুম তাদের মনে তাঁর প্রতি একটি আশ্চর্য্য বিস্ময় প্রতিবারে নূতন করে উদ্ভাসিত হত। মানুষের মধ্যে কুৎসিত আছে, সৌন্দর্য্য আছে, দৈন্য আছে ; তার বিত্তও অসীম। কিন্তু সেই সৌন্দর্য্য যে কতখানি পূর্ণরূপ নিতে পারে, সসীম মানুষ তার আপন গণ্ডীকে অতিক্রম করে কোন অসীমে যেতে পারে— মানুষের যা আদর্শ মানুষের যা হওয়া উচিৎ তার এমন পূর্ণ প্রকাশ গুরুদেবকে না দেখলে আমরা বুঝতে পারতুম না। সে সৌন্দর্য্য যে শুধু কাব্য সৃষ্টিতে তা নয়। সেই অপরূপ লাবণ্য তাঁর সমস্ত জীবনের মধ্যে পরিব্যাপ্ত হয়ে প্রতিটি ব্যবহারে প্রকাশ পেত। তাঁর সংস্পর্শে এলে জীবনের স্থূল বিষয়গুলোও সুকুমার রূপ নিত। তাঁর দৈনন্দিন প্রতিটি ভঙ্গীই যেন চারু শিল্প, তাই এত অপর্য্যাপ্ত কাজের বোঝা থাকা সত্বেও তাঁকে কোনদিন ভারাক্রান্ত বা ব্যতিব্যস্ত মনে হত না। নিপুণ শিল্পী যেমন অনায়াসে তার হাতের কাজ করে যায় তেমনি অনায়াসে সহজে তিনি তাঁর বিপুল কর্মজীবনকে বহুদিকে প্রসারিত করেছিলেন। আমাদের আজকের শিক্ষা সংস্কৃতি শিল্পকলা এমনকি আমাদের জাতীয় জীবন তাঁরই অনুপ্রেরণায় তাঁরই শিক্ষায় এতখানি জেগেছে যে এই কাজ একটি জীবনের পক্ষে আশ্চর্য্য কীর্ত্তি। এ ছাড়াও এত বড় একটা ইনষ্টিটিউশ্যান

কত বাধা বিপত্তির তুফান ঠেলে তিনি গড়ে তুলেছেন যাতে শুধু এ কাজটাই একটী দীর্ঘ জীবনকে কর্মময় করে রাখবার পক্ষে যথেষ্ট। লেখক বা কবি হিসাবেও কোনো যুগে কোনো দেশে এত বড় শক্তি জন্মেছেন কিনা জানিনা। কালিদাস, সেকস্পীয়ার, ওয়ার্ডসোয়ার্থ, শেলী কতটুকু তাঁদের কাজ, ক'খানা বা বই আর প্রত্যেকেরই মাত্র এক একটি দিক। এত বিচিত্র অনুভূতি এত বিভিন্ন রস এমন প্রাচুর্য্যের সঙ্গে আর কোনো কবি দিতে পেরেছেন বলে জানা নেই। গানেরই তো শুধু এক বিরাট সমুদ্র, শুধু কথা নয় তার প্রতিটি সুর। প্রতি বইতে তাঁর ষ্টাইল বদলেছে, ভাষা বদলেছে, কাব্য জীবনের তাঁর প্রতি পদক্ষেপ অপূর্ব নূতন নূতন রসে পূর্ণ হ'য়েছে। তিনি যে কতদিক থেকে কত রকমে আপনাকে দিয়েছেন তা নিয়ে এখানে বিস্তারিত আলোচনা চলবে না। কারণ তার প্রতিটি বিষয় নিয়ে এক একটি বই লেখা চলে এবং লেখা উচিৎ। কিন্তু আমি শুধু বলছিলাম যে অপর্য্যাপ্ত কাজের মধ্যে থেকেও তাঁর যেন ছিল অখণ্ড অবসর। এত যে বিরাট চিন্তাশীল প্রতিভা, মননশীল মন, তবু অর্বাচীনদের বাজে গল্প শুনতে তাঁর ভালই লাগত। এতদূর পর্য্যন্ত প্রশ্রয় দিতেন যে অনায়াসে সব বিষয় নিয়ে সমভাবেই তর্ক করা চলত। যাকে বলা হয় হিউম্যান ইণ্টারেষ্ট কবি মাত্রেরই তার কিছু-না-কিছু না থাকলে কবি হতে পারে না। কিন্তু তার এমন সরস সহৃদয় ও স্নেহপূর্ণ সহাস্য কৌতুক প্রকাশ জগতে দুর্লভ। একটা

দিনের কথা চোখের সামনে ভাসছে। সেদিন পুপুর বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে, খবর এল। গুরুদেব তাঁর লেখবার ঘরে টেবিলের উপর ঝুঁকে নিবিষ্ট মনে "শেষকথা" গল্পটা লিখছেন। আমাদের তো বিরক্ত করতে লজ্জা নেই—দল বেঁধে পিছনে গিয়ে দাঁড়ালুম, আমাদের মধ্যে একজন বল্লেন, "গুরুদেব নাতনীর বিয়ে ঠিক হয়ে গিয়েছে খাব।" উনি তৎক্ষণাৎ কলমটি বন্ধ করে চেয়ারে ঘুরে বসে যেন ভীষণ ভয় পেয়ে গেছেন এমনি মুখ করে জিজ্ঞাসা করলেন, "কাকে ?" সুধাকান্ত বাবুর তো ready wit হাসির পর্ব থামতেই বল্লেন "পাঁঠাকে"।

তারপর সব ব্যবস্থা চলল—পরামর্শ হতে লাগল কি কি রান্না হবে কে কে আসবে তার প্রত্যেকটি খুঁটিনাটির প্রতি তাঁর সমান উৎসাহ। মস্ত বড় শক্তি বলে কোনো প্রচণ্ড ভাব তাঁর মধ্যে সদাসর্বদা প্রকাশ পেতনা। অত্যন্ত সহজে তিনি সাধারণের সঙ্গে মিলিত হতেন এবং একটি বিশুদ্ধ অনাবিল আনন্দ প্রবাহ সর্বদা সৃষ্টি করতেন, যাতে তাঁর প্রতিটি ভঙ্গী প্রতিটি ব্যবহারে অবিশ্রাম মাধুর্য্য উৎসারিত হত আজ তা ব্যাখ্যা করে কোনো মতেই বোঝান যাবেনা। তাই বলছিলুম সাধারণত কাজের মানুষদের যে ব্যস্ততা এবং যে উদ্বিগ্নতা দেখা যায় তা তাঁর মধ্যে কোনো দিন দেখিনি—শান্তভাবে হাসিমুখে তিনি কত অবাঞ্ছনীয় লোককেও সময় দিতেন যেন তাঁর কোনো কাজই নেই। এমন অপর্য্যাপ্ত ছুটির সঙ্গে এমন বিপুল বহুমুখী কর্মস্রোতকে তিনি কি করে মেলাতেন তা ভাবলে আশ্চর্য্য বোধ হয়।

একবার তিনি বলেছিলেন ঝরণার সঙ্গে কলের জলের যা প্রভেদ, কবির সঙ্গে কেজো লোকের তাই। কেজো লোকের যতই কাজ থাক তার ছুটি আছে, কিন্তু কবির তা নেই, যেমন কলের জল সে জল দেয়, নির্দিষ্ট সময়মত ছুটিও নেয়, কিন্তু নির্জন গুহাতলে একটি মাত্র লোক না থাকলেও ঝরণার ছুটি নেই।" আজ বুঝতে পারি—এক মুহূর্ত ছুটি তাঁ'র ছিল না—তাঁর কাজ অলক্ষ্যে সব সময় চলত—জীবনের সব রকম দিক থেকে। আপাত দৃষ্টিতে যা অবান্তর এবং অপ্রয়োজনীয় মনে হয় তার মধ্য থেকে তিনি রস নিতেন। তাই এত বিচিত্র রসময় হতে পেরেছিল তাঁর জীবন। তিনি জানতেন জীবনের ধন কিছুই যায় না ফেলা। বস্তুত কিছুই ফেলা যায় নি। তাঁর চেতনায় প্রবেশ করে তাই বহু তুচ্ছ ঘটনা বহু সাময়িক বেদনাও অক্ষয় হয়ে গেছে। মানুষের কত বেদনা, কত আনন্দ, কত স্নেহ, কত প্রীতি এবং কত ভেসে যাওয়া মুহূর্ত তাঁর স্পর্শে অক্ষয় হয়ে চিরকালের মানবের আনন্দের জন্য সঞ্চিত হয়েছে।

আর একটা বিষয় ভারি আশ্চর্য্য বোধ হত যে তিনি নিজে কখনো নিজের মতামত অন্যের উপর জোর করে চাপাতেন না। ধমক বা জবরদস্তি করে কাউকে কখনো কোনো বিষয়ে বাধ্য করা তাঁর স্বভাব বিরুদ্ধ ছিল। সাধারণত প্রত্যেকের মনেই কর্ত্তৃত্বের স্পৃহা রয়েছে। বিশেষত এই রকম বিরাট ব্যক্তিত্বের পক্ষে সেই কর্ত্তৃত্ব স্বাভাবিক এবং যোগ্য। কিন্তু যেমন তাঁর নিজের মন স্বাধীন ছিল, সাময়িক বা প্রচলিত মতামতের দ্বারা

তা কখনই প্রভাবান্বিত হতনা, তেমনি অন্যকে স্বাধীনতা দেওয়াও তাঁর পক্ষে স্বাভাবিক ছিল। তা যদি না হত, যদি তিনি তাঁর ব্যক্তিত্বের প্রভাবের দ্বারা বা স্বভাবের প্রবলতার দ্বারা, যে কোনো উপায়েই অন্যের স্বাধীন মতামত দমন করবার বিন্দুমাত্র চেষ্টা করতেন, তাহলে যে রকম সামান্য লোকদেরও তাঁর সামনে নিজের মতামত জোরের সঙ্গে প্রকাশ করতে দেখেছি তা কখনো সম্ভব হত না। একটা অসামান্য দূরত্ব থেকে এবং বৃহত্তর দৃষ্টিতে মানুষ ও সংসারকে দেখতেন বলে যদি কখনো নিজের ভুল বুঝতেন তবে নগণ্য লোকের কাছেও ক্ষমা চেয়ে বসতে তাঁর দ্বিধা ছিল না। নিজেকে তিনি সহজে ছেড়ে দিতেন না কঠিন সমালোচকের দৃষ্টিতে নিজেকে দেখতেন। কী তাঁর কাব্যজীবন কী কর্মজীবন কী ব্যবহারিক জীবন সর্বত্র ছিল নিজেকে বিচার। প্রতিটি লেখার পিছনে তাই কী অক্লান্ত পরিশ্রম করতেন। বারবার সংশোধন করে বারবার কেটে বারবার পরীক্ষা করে তবে তিনি ছেড়েছেন। সহজেই কোনো লেখা ছেড়ে দেন নি। আরো ভালো থেকে আরো ভালো করবার জন্য কাব্যের স্বতঃস্ফূর্ত মূর্ত্তিকে সাধনার মূল্য দিয়ে সুচারু সুন্দর করেছেন। তেমনি তাঁর ব্যবহারিক জীবনেও সদা জাগ্রত দৃষ্টি ছিল নিজের প্রতি। পাছে কোনো অনৌদার্য্য ঢুকে পড়ে সেজন্য অতিমাত্রায় সচেতন থাকতেন। একবার একজনের সম্বন্ধে তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, যে-আপনি এঁর অনেক কাজ সমর্থন করেন না, এঁর অনেক ব্যবহার আপনার অপ্রিয়,

তবু একে এত প্রশ্রয় দেন কেন? বস্তুত নানা ক্ষতি সত্বেও তিনি তাঁকে সর্বদাই সস্নেহ প্রশ্রয় দিতেন—আমাদের প্রশ্নের উত্তরে গুরুদেব বলেছিলেন তোমরা জাননা এক সময় এর বাপ আমার অনেক শত্রুতা করেছেন সেজন্য আমার সর্বদা আশঙ্কা হয় এর সঙ্গে ব্যবহার করবার সময়, পাছে ও মনে করে যে আমি সেজন্য একটুও বিদ্বেষ মনে করে রেখেছি।—নিজেকে তিনি প্রতিপদে বিচার ক'রে চালনা করতেন। তাঁর অমন বিশ্বপ্রসারী প্রভাব ও স্বাভাবিক শক্তির প্রবলতা তাই কখনো অন্যকে ভীত বা তটস্থ করতনা। একটা অভূতপূর্ব মাধুর্য্যে সর্বদা স্নিগ্ধ হয়ে সর্বদা সহাস্যমুখে সামান্য লোককেও অভ্যর্থনা করতেন। যত কাজেই ব্যস্ত থাকুন না কেন কেউ পাশে এসে দাঁড়ালে কৌতুকে পরিহাসে তাকে তার পাওনাটুকু মিটিয়ে দিতেন। এই ঘটনাগুলো শুনতে বিশেষ কিছুই নয়। কিন্তু কত যে দুর্লভ তা যাঁরা অন্যান্য কাজের লোকের সংস্পর্শে এসেছেন সে সব অভিজ্ঞতার সঙ্গে মেলালেই বুঝতে পারবেন। সাধারণত অধিকাংশ মানুষের এমন কি অনেক প্রতিভাশালী মহামানবেরও আদর্শের এবং ব্যক্তিগত জীবনে অনেক পার্থক্য থাকে। যা আমরা উচিৎ বলে মনে করি বা প্রচার করি, তা আমরা নিজের জীবনে করে উঠতে পারি না। সৌন্দর্য্যকে চিনি কিন্তু জীবনে তা প্রতিফলিত হয় না। অনেক লোকেই যা বলে যা লেখে তাদের নিজেদের জীবন তার বহু বহু নিম্নে পড়ে থাকে। এমন কি অনেক বড় বড় বৈজ্ঞানিককেও কুসংস্কারী হতে দেখা গিয়েছে—কিন্তু বিস্ময়ের

সঙ্গে মনে হয় কবির সমস্ত জীবন যেন ছিল রবীন্দ্রকাব্যের মূর্তি। যে সৌন্দর্য্য তাঁর কাব্যজীবনে নানা ভাষায় নানা রসে রূপ নিয়েছিল, সেই সৌন্দর্য্যই তাঁর দৈনিক জীবনের প্রতিটি ভঙ্গীতে পূর্ণ ছিল। যা রূঢ় যা কর্কশ তা তাঁর চার পাশে কোথাও স্থান পেতনা, যে ভাষায় তিনি সর্বদা কথা বলতেন তাও ছিল সাহিত্যের ভাষা। এমন কি যখন কাউকে ভর্ৎসনা করতেন তখনও তাঁর ভাষা নেমে আসত না। প্রায় বিশ বৎসর ধরে আমি তাঁকে নিকট থেকে দেখবার সুযোগ পেয়েছি কিন্তু কখনো তাঁকে জোরে চেঁচিয়ে কাউকে ভর্ৎসনা করতে শুনিনি। কখনই প্রায় আত্মবিস্মৃত হতেন না। মনে যদি উত্তেজনা যথেষ্টও হোত বাইরে তার কোনো অশোভন প্রকাশ ঘটা নিতান্তই অসম্ভব ছিল। এ বিষয়ে যাঁরা তাঁকে আরো দীর্ঘদিন দেখবার সুযোগ পেয়েছেন তাঁরা আপনাদের বিশেষ করে বলতে পারবেন। কিন্তু আমরা যাঁরা অন্য আবেষ্টন থেকে তাঁর কাছে আসতুম আমাদের মনে স্বভাবতই তুলনা আসত এবং বিস্মিত হয়ে দেখতুম যে ভৃত্যকেও ভর্ৎসনা করবার সময় তিনি তাঁর সুমধুর ভাষার সঙ্গে কৌতুক মিশিয়ে ভর্ৎসনা করতেন। স্বাভাবিকের চেয়ে গলার স্বর এক পর্দাও উপরে উঠত না!

আর একটি বিষয় লক্ষ্য করতুম যে তিনি ছোট বড় সকলকেই এমন একটি স্বাভাবিক মর্য্যাদা দিতেন, যে ছোট যে সামান্য তারও আত্মবিশ্বাস জাগত। যে অর্বাচীন এবং খুবই সাধারণ তার সঙ্গেও তিনি অনেক সময় এমন সব

আলোচনা করতেন সাহিত্যই হোক কী সমাজতত্ত্বই হোক বা যে কোনো বিষয়ই হোক এমনভাবে তার মতামত জিজ্ঞাসা করতেন যেন সে তাঁরই কাছাকাছি। অনেক সময় আমার মনে হয়েছে যে গুরুদেব কী বুঝতে পারেন না যে আমি কত অজ্ঞ কতই সামান্য জানি এবং কতই আমার অযোগ্যতা! কিন্তু এখন বুঝতে পারি তাঁর শিক্ষা দেবার প্রণালীই ছিল অন্য রকম। তিনি জানতেন অযোগ্যকে অযোগ্য বলে ব্যবহার করলে তার যোগ্যতা বাড়ে না, মূঢ়কে তার মূঢ়তা স্মরণ করিয়ে দিলেই মূঢ়তা দূর হয় না। বরং অযোগ্যকে যোগ্য বলে ব্যবহার করলেই তার আত্মবিশ্বাস জাগে—সে মানুষ হয়ে ওঠবার সুযোগ পায়। তিনি বিশ্বাস করতেন না যে উঁচু মঞ্চ থেকে বক্তৃতা বা উপদেশ দিয়ে যথার্থ কিছু শেখান যায়। প্রায়ই তাই বলতেন যে, মাটি করে দেয় এই অধ্যাপকের দল। জগৎশুদ্ধ লোককে তারা ছাত্র মনে করে। তাই যখন কিছু বোঝাতে যায় এমনভাবে বলে যেন ক্লাসে পড়া বোঝাচ্ছে! এমন কি শিশুসাহিত্য সম্বন্ধেও বলতেন যে প্রায়ই দেখি ছোটদের জন্য যে সব বই লেখা হয় তার অধিকাংশতেই একটা মাষ্টারীর চেষ্টা, যে কিছু বোঝেনা একজন বিজ্ঞ যেন তাকে বোঝাতে বসেছে, প্রতিপদে সেই পিঠ চাপড়ে বোঝান ব্যবহারটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এর কিছু মাত্র দরকার নেই। সহজভাবে যা বক্তব্য তা বলে গেলেই হয়। আজ এই সব নানা কথাকে একত্র মনে করে তার সম্পূর্ণ তাৎপর্য্য বুঝতে পারি। কিন্তু ছোটবেলায় ভারি আশ্চর্য্য বোধ

হত যখন দেখতাম যে কেমন সহজে ও আনন্দে তিনি গুরুতর বিষয় ও সামান্য লোকের সঙ্গে আলোচনা করছেন। তিনি জানতেন মানুষকে মর্য্যাদা দিলে ভার দিলে তবেই সে যোগ্য হয়ে উঠবার সুযোগ পায়—ছোটকে প্রতিপদে তার ক্ষুদ্রতা স্মরণ করিয়ে দিয়ে কোনো উপকার সাধিত হয় না। তুমি বুঝবেনা এ কথা বলার দ্বারা বোধ শক্তি বাড়ে না বরং যেন তুমি সমস্তই বোঝ এইভাবে বোঝালেই তার আত্মবিশ্বাস তার বোঝবার চেষ্টা জাগ্রত হয়। মানুষকে এই ভিতর থেকে তৈরী করে তোলার তাঁর নিজের একটি বিশেষ প্রণালী ছিল। সে শিক্ষা জীবনের গভীরতম বিষয়গুলিতেও ব্যাপ্ত ছিল। আপনাকে তিনি নামিয়ে এনে সামান্যকে সম্মান করেছেন তাতে তাঁর নিজের কোনোই ক্ষতি হয়নি কিন্তু অপরের প্রচুর লাভ হয়েছে। সে লাভ শুধু বাহ্যিক সম্মানের নয়। তার ভিতরে আত্মার শক্তিকে তা জাগিয়েছে—তাতে 'সঙ্কোচের বিহ্বলতা' কেটেছে এবং নিজের উপর নির্ভরতা বেড়েছে। এই প্রসঙ্গে একটা কথা মনে পড়ল। একদিন এই উত্তরায়ণে সামনের ঘরে গুরুদেব বসেছিলেন। আওয়াগড়ের রাজা তখন এখানে উপস্থিত। রাজাও এসে একপাশে বসলেন। তখন গুরুদেবের কাছে একজন নিতান্ত সাধারণ ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। রাজা তার পরিচয় জিজ্ঞাসা করায় গুরুদেব তার নাম বলে তারপরে বল্লেন "মেরা দোস্ত"। এই আশ্চর্য্য সম্মান লাভ করবার উপযুক্ত কোনো যোগ্যতাই সে ব্যক্তির ছিল না। বস্তুত গুরুদেব যাঁকে দোস্ত বলতে পারেন

এরকম ক'জন লোক সারা ভারতেই আছে এবং এও জানি সংসারে খুব কম লোকই এমন করে অসমানকে উঠিয়ে আনতে পারে! কিন্তু এতে তাঁর তো কোনো ক্ষতি হয়নি। অথচ যে সামান্য অন্তরে সে একটি অসামান্যতা লাভ করেছে। আমরা তো সবাই জানি সংসারে ধনী দরিদ্রের কুলীন অকুলীনের অভিজাত অনভিজাতের বুদ্ধিমান ও নির্বোধের পণ্ডিত ও মূর্খের কত শ্রেণী কত পংক্তি। ছোট কি কখনো বড়র নাগাল পায়? কিন্তু সমস্তরকম শ্রেষ্ঠত্বের যে সুদূর উর্দ্ধলোকে তাঁর মহিমান্বিত আবির্ভাব হয়েছিল খুব কম লোকেই তাঁর নাগাল পেত, যদিনা তিনি আপনি আসতেন আপনি মিলতেন এবং সেই মিলনে তাঁর সংস্পর্শে এলে মানুষের মধ্যে যা মনুষ্যাতীত, ছোটর মধ্যে যা বড়, তা ফুটে উঠবার সুযোগ পেত। যাকে উদ্দেশ্য করে তিনি একদিন লিখেছিলেন "নমি নর দেবতারে।"

মানুষকে সম্মান করলে সে সম্মানার্হ হবার সুযোগ পায় কিন্তু তাই বলে একথা বলা চলেনা যে সবাই সে সুযোগকে যথাযথ ভাবে গ্রহণ করেছে। বস্তুত তাঁর এই প্রশ্রয়ের, মহত্বের সুযোগ পেয়ে অনেকে হয়ত উদ্ধত হয়েছে। অনেকের আত্মম্ভরিতা বেড়েছে। যাদের তাঁকে বোঝবার এক বিন্দুও ক্ষমতা বা শিক্ষা নেই তারাও তাঁর কাজের সমালোচক হ'য়ে উঠেছে। সমভাবে ব্যবহার করতেন বলে হয়ত অনেকের মনে হয়ে থাকবে যেন তারা সমান হয়েই গেছে, যেন তাঁকে বুঝবার জন্য জানবার জন্য কোনো শিক্ষা কোনো সাধনার প্রয়োজন

নেই। কিন্তু সেজন্য তাঁকে আমরা দায়ী করতে পারি না। যে মহৎ ঔদার্য্য দিয়ে তিনি মানুষকে স্পর্শ করতেন যদি তাতে কারু মহত্ব না জেগে থাকে তবে সে দুর্ভাগ্যের জন্য তাঁকে দোষী করা চলে না। মধুর কলসীর ভিতর ডুবে থাকলেও কাঠের হাতা যে মাধুর্য্য বুঝতে পারে না, সে তার আপন ভাগ্য।

বস্তুত তিনি বেঁচে থাকতে তাঁর যত সমালোচনা অযোগ্য লোকের স্পর্দ্ধিত কণ্ঠে বারবার আমরা শুনেছি তা ভাবলে আজ আশ্চর্য্য বোধ হয়। নিন্দার কাজ ভাঙ্গার কাজ, তাতে কোনো ক্ষমতার প্রয়োজন নেই—কিন্তু যে অবিশ্রাম গড়ার কাজ যতদিকে নানাবিধ সৃষ্টিতে তিনি প্রতিদিন করে চলেছিলেন আমরা আজও তা সম্পূর্ণ উপলব্ধি করতে পারি না। আমাদের তো সবই গিয়েছিল এমন কি সামান্য শিষ্টাচার পর্য্যন্ত বিস্মৃত হয়েছিলুম—পরস্পর দেখা হলে যে একটা নমস্কারের সম্ভাষণ তাও যেন বাঙালী ভুলে গিয়েছিল, তাও তিনি নূতন করে শেখালেন—যেমন তাঁর পারিবারিক জীবনের প্রতিটি খুঁটিনাটির প্রতি দৃষ্টি তেমনি তার জাতীয় জীবনেরও প্রতিটি ক্ষুদ্র ব্যাপারেও সদা জাগ্রত দৃষ্টি ছিল। সর্বাঙ্গ সুন্দর করে আমাদের বিশেষ জাতীয় চেতনাকেই তিনি জাগিয়ে তুলতে চেয়েছেন। পশ্চিম সভ্যতার সর্বগ্রাসী প্রভাবের নীচে যাতে আমরা না তলিয়ে যাই এ জন্য চিন্তাজগতে এবং ব্যবহারিক জীবনেও তিনি জাতীয় বিশেষত্বকে জাগিয়ে তুলতে চেয়েছেন। কোন একটি জাতকে

বড় করে তুলতে হলে তাকে সমস্ত দিক থেকে সচেতন করে তার সৌন্দর্য্যবোধ, তার রুচি, তার কার্য্যক্ষমতা, তার বিশেষত্ব-গুলিকে জাগিয়ে না তুলতে পারলে একপেশে পুঁথিগত শিক্ষার দ্বারা ফল পাওয়া যায় না। গুরুদেব একবার বলেছিলেন যে যখন আমাদের সুদিন ছিল তখন মেয়েরা যে-মাটির কলসীতে জল আনত তাতেও আল্পনা আঁকা থাকত, তার মধ্যেও জীবনের আনন্দ আর্ট হ'য়ে প্রকাশ পেত, কিন্তু আজ যখন দেখি ক্যানেস্তারায় করে জল আনতে কোথাও বাধে না তখন বুঝি সে জাতের কত গভীর লোকসান হয়ে গেছে।

আজ শান্তিনিকেতনে দাঁড়িয়ে বুঝতে পারি সেই লোকসানকে তিনি কেমন ভাবে পূরণ করতে চেয়েছিলেন। কবির কল্পনা আজ রূপ গ্রহণ করেছে। আধুনিক সভ্যতার সমস্ত সুফল গ্রহণ করেও আমাদের প্রত্যেকটি বিশেষত্বকে বজায় রেখে কেমন করে আমাদের বিশেষ সংস্কৃতি ও শিল্পকে জাগিয়ে তোলা যায় একমাত্র শান্তিনিকেতনে এলেই আমরা তা বুঝতে পারি এবং জানতে পারি। এজন্য যাঁরা এর রূপকার তাঁরাও আমাদের ধন্যবাদার্হ। কিন্তু শুধুমাত্র ঋণ স্বীকার বা একটা প্রশংসাসূচক উক্তিতেই আমাদের কর্তব্য শেষ হয় না।

আমরা যারা শান্তিনিকেতনের সংস্পর্শে এসেছি তাদের তার চেয়েও বড় কর্তব্য আছে। এই আদর্শ এখান থেকে আমাদের সর্বত্র সঞ্চারিত করতে হবে। সমস্ত দেশের মধ্যে যাতে এই

সুরুচি সৌন্দর্য্যবোধ স্থায়ী হয়। যাতে আমাদের ব্যবহারিক জীবন এই বিশেষত্বটি লাভ করতে পারে—তার জন্য সচেতন ভাবে সক্রিয় না হলে গুরুদেবের আদর্শ সফল হবে না। তাঁর প্রভাব আমাদের জীবনের মধ্যে পড়লে আমরা জগতকে নূতন দৃষ্টিতে দেখতে পাই। যাঁরা ব্যক্তিগত জীবনে তাঁর কাছাকাছি এসে তাঁর বিপুল শক্তির ও গভীর পূর্ণতার স্পর্শ পাবার সৌভাগ্য লাভ করেছেন তাঁদের পক্ষেও যেমন তেমনি যাঁরা তাঁর কাব্য তাঁর কর্ম এবং প্রেরণার ভিতর দিয়ে তাঁকে জেনেছেন তাঁদের সকলেরই নবজীবন লাভ হয়েছে। বৃহতের সংস্পর্শে এলে মানুষের ভিতর যা বড়, যা মহৎ তা জেগে উঠবার সুযোগ পায়—একথা অস্বীকার করা চলে না। তাঁর কত সাধনা, কত তপস্যা কাব্যের মধ্যে ও শান্তিনিকেতনের নানা কর্মের মধ্যে আমাদের জন্য সঞ্চিত হয়ে আছে তা সম্পূর্ণভাবে বুঝতে হলে এবং তার যথার্থ উত্তরাধিকারী হতে হলে আমাদেরও সাধনা প্রয়োজন। তিনি তো দুহাতে দিয়েছেন কিন্তু সে দান গ্রহণেরও উপযুক্ত হতে হবে। যেন সেই বিরাট মহিমা আমাদের অলসতার ও জড়তার বাধায় ফিরে না যায়। মৃত্যু তাঁর দেহকে আমাদের কাছ থেকে হরণ করে নিয়ে গেছে। কিন্তু আমাদের জীবনের গৌরবে তাঁর অস্তিত্ব যেন প্রতিদিন পূর্ণতর হয়ে ওঠে!

শান্তিনিকেতন মহিলা সভায় পঠিত।

পৌষ, ১৩৫২

অবনীন্দ্রনাথ

শ্রদ্ধেয় অবনীন্দ্রনাথের চরণে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করব। তাঁর সম্বন্ধে বেশী কথা বলবার ক্ষমতা আমার নেই, যদিও শিশুকাল থেকে রবীন্দ্রনাথের সন্নিধানে এই দুই কীর্তিমান খুড়োভাইপোর মিলন দেখবার সুযোগ ঘটেছে। অনেক সুদীর্ঘ আলোচনাও শোনবার সুযোগ পেয়েছি, কিন্তু সঞ্চয় করে রাখবার মত বুদ্ধি তখন ছিল না। তখন বুঝতেও পারিনি কি অসামান্য ঐতিহাসিক ঘটনা চোখের সামনে দেখছি। একদা কবিগুরু পরিহাস করে বলেছিলেন,—"তোমরা বিলম্বে এসে পৌঁছেচ, ট্রেণ যখন হুইসেল দিয়ে ছেড়ে দিয়েছে তখন তোমরা দৌড়ে এসেছ ধরতে!" একথা তখনকার বাংলা দেশের অবস্থায় পুরোপুরি সত্য। আমাদের শৈশবে এ দেশে প্রতিভা-উজ্জ্বল অস্তগমনোন্মুখ অনেক ভাস্বর মূর্তি আমরা অল্প সময়ের জন্য দেখবার সুযোগ পেয়েছিলুম।

দেখেছি বিপিন পালকে বক্তৃতা মঞ্চে। দেখেছি মহাপ্রাজ্ঞ ব্রজেন্দ্র শীলকে জটিল গূঢ় দার্শনিক চিন্তাজাল বিকীর্ণ করতে।

দেখেছি বিচক্ষণ স্থিতবুদ্ধি রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়কে জনতার মনকে যুক্তিতে নিয়ন্ত্রিত করতে! এবং সর্বোপরি আর যা দেখেছি সে কথা স্মরণ করতে আজ হৃদয়মন অশ্রুচঞ্চল হ'য়ে উঠছে। দেখেছি রবিকরোজ্জ্বল জোড়াসাঁকোর বাড়ির শেষ শোভা। সেই বিদ্যাবুদ্ধি-সংস্কৃতি-সাধনা শিল্প ও সৌন্দর্য্যের লীলা নিকেতন যা এক সময়ে বাংলা দেশকে সব দিক থেকে উদ্বুদ্ধ ক'রে ভারতবর্ষের উজ্জ্বলতম মণি করেছিল—বিদ্যুৎ চমকের মত তার প্রভা আমরা যে দেখতে পেয়েছিলুম, আজ পূজনীয় অবনীন্দ্রনাথকে স্মরণ করতে গিয়ে সেই সব কথা মনে আসছে। তাঁদের কীর্তি যে কী, তাঁদের সৃষ্টির যে কি মূল্য, যে দেশ আত্ম-প্রত্যয় হারিয়ে পরমুখাপেক্ষী হয়ে পরের দরজায় হাত পেতেছে হঠাৎ সেই ভিখারিণীকে রাণীর মুকুট পরিয়ে দিয়ে জগৎসভায় সিংহাসনে বসিয়ে দিতে পারা যে কি, তা যখন কিছুমাত্র বোঝবার বয়স আমাদের হয় নি—তখন তাঁদের আমরা দেখবার সুযোগ পেয়েছিলুম। সেই স্মৃতি আজ মৃদু সৌরভের মত মনের সামনে আসছে। এবং একথা মনে পড়ছে যে পরিষ্কার করে কিছু বুঝি বা না বুঝি দ্বারকানাথ ঠাকুরের গলির মুখে আসামাত্র বুকের মধ্যে রক্ত দ্রুত সঞ্চালিত হত। অজানিতে একথা মর্মে প্রবেশ করত যে এখনি যাঁদের সম্মুখীন হব তাঁরা চালে চলনে বিদ্যায় বুদ্ধিতে শিক্ষায় আভিজাত্যে জন সাধারণের মধ্যে দীর্ঘকায় আকাশবিলম্বী হ'য়ে দাঁড়িয়ে আছেন। সেখানে প্রত্যেকটি ঘরোয়া জিনিষপত্র চৌকি টেবিল এমন কি ছবির

ফ্রেমটি পর্য্যন্ত অসাধারণ, কিন্তু অস্বাভাবিক নয়! সুসজ্জিত বিচিত্রা-গৃহ কত দেশের কত আশ্চর্য্য সুন্দর সুন্দর জিনিষে সাজান—মনে হত যেন পৌরাণিক যুগের রাজপুরীতে প্রবেশ করেছি। সে বাড়ির বারবার দেখাও যে ঘরটি পরদার আড়ালে থাকত, মনে হত ওই পরদার পিছনে কোন্ রূপকথার রাজ্য আছে। যে রূপকথার রাজকুমার অবনীন্দ্রনাথের তুলি থেকে বেরিয়ে ঘন অরণ্য পার হয়ে অজানা শূন্য রাজপুরীর সন্ধানে চলেছে,—যে রূপকথার রাজপ্রাসাদ গগনেন্দ্রনাথের বিচিত্র তির্য্যগ রঙ্গের ভঙ্গীতে রহস্য ঘন হয়ে চিত্রিত হয়েছে, সেই স্বপ্ন লোকের অপরূপ রূপকথার জগৎ মনের মধ্যে জেগে উঠত এই আশ্চর্য্য সুন্দর সজ্জিত বাড়িতে এই অদ্ভূত-কর্মা জন্ম-অভিজাত ব্যক্তিদের সান্নিধ্যে।

মনে পড়ে পাঁচ নম্বর বাড়ির খোলা জানালা দিয়ে কর্মনিরত গগনেন্দ্রনাথের মণ্ডিত মুখশ্রীর অংশ কখনো কখনো দেখা যেত। উৎসবে অনুষ্ঠানে দীনেন্দ্রনাথের গম্ভীর মধুর সম্মোহনকারী কণ্ঠের গীতধ্বনি স্পন্দিত হত। কখনো দেখতুম বিচিত্রার পাশে একটা কোণের ঘরে রবীন্দ্রনাথ দিব্যজ্যোতি বিকীর্ণ করে রচনানিরত। স্তব্ধ গৃহ থেকে মৃদু সৌরভ উঠে আসছে—আর পশ্চিমের বারান্দা পার হয়ে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'রইকা'র সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসছেন। যে পোষাকে তাঁদের দীর্ঘদেহ আচ্ছন্ন সে কখনো কোনো বাঙালীর অঙ্গে দেখিনি—মনে হত এঁরা যেন ছবি থেকে উঠে এসেছেন—। সেই আভূমি

লম্বিত দীর্ঘ পরিচ্ছদধারী মূর্তি, স্থির অচঞ্চল পদক্ষেপে এগিয়ে আসছে—দুটি হাত পিছন দিকে একত্র করা, হয় একটা পানের কৌটা—তা সে যে সে কৌটা নয়!—নয়ত একটা বই—সেই একত্রিত করপল্লবে ধৃত আছে। ধীরে ধীরে এসে ঘরের বাইরে জুতো রেখে প্রবেশ করতেন—তারপরে চলত প্রায়-সমবয়সী খুড়ো-ভাইপোর আলোচনা। কি তাঁরা বলতেন, কি তাঁরা চিন্তা করতেন তা তখন সব বুঝতুমও না, শুধু মনে পড়ে আশ্চর্য্য হয়ে দেখতুম এঁদের স্বর কখনো উচ্চ হ'য়ে সীমা লঙ্ঘন করে না। ধীর স্থির অথচ হাস্য পরিহাসে উজ্জ্বল আভিজাত্যের সুন্দর মহিমা! একদিন বাউলের গান নিয়ে আলোচনা চলছিল, হঠাৎ রবীন্দ্রনাথ মৃদু স্বরে সেই গানটি গেয়ে উঠলেন। শিল্পী বসে রইলেন স্তব্ধ হয়ে—আজ সেই দিনটি ছবির মত মনে আসছে। সেই যে যুগ—যা পৃথিবী থেকে আজ হারিয়ে গেল—যা এঁরা সৃষ্টি করেছিলেন রূপে রসে শিল্পে কলায় সৌন্দর্য্যে সাধনায়—যে স্বর্গালোক এঁরা বাস্তবরূপে এঁদের গৃহে এবং জীবনে প্রতিফলিত করেছিলেন তা আমাদের পরবর্তীরা দেখতে পাবে না। ফিরিয়ে এনেছিলেন সেই ভারতকে তাঁদের গৃহসীমার মধ্যে, যে ভারতে একদিন "শালপ্রাংশু ব্যূঢ়োরস্ক সভ্যতা" বিচরণ করত। সেই এঁদের বিপুল প্রয়াস হয়ত অনেক রকমে দেশের মধ্যে সার্থক হয়েছে। আজ আমরা অনেক জিনিষকে সুন্দর বলে চিনতে পারি যা আমরা এঁদের চোখের ভিতর দিয়ে না দেখলে লক্ষ্যই করতুম না। তবু আজ এই ক্ষোভ হয়, যে উজ্জ্বল

দীপান্বিতা জ্বলেছিল বাংলা দেশে আজ তা নির্বাপিত। সে বাড়ি অন্ধকার। শুধু একাকী দীপশিখা হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন অবনীন্দ্রনাথ—সেই বিরাট মহিমান্বিত অতীতের একমাত্র প্রতিভূ।

উৎসব

আজ এই অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করবার অনুরোধ পেয়ে আনন্দিত হয়েছি। বক্তৃতা দেবার স্থান এ নয় এবং আমরাও বক্তৃতা প্রয়াসী নই, শুধু এই সম্মানলাভের জন্য কৃতজ্ঞতা জানিয়ে ও এই উৎসবের সার্থকতা সম্বন্ধে দু একটি কথা বলে আমার বক্তব্য শেষ করব।

এক সময়ে আমাদের দেশে বারমাসে তের পার্বণ ছিল। মানুষের মন তার নিত্য প্রয়োজনের গণ্ডীর মধ্যে আবর্তিত হয়ে সুখ পায় না। সে আনন্দে-উৎসবে গানে-ছন্দে ভোগে-লাস্যে আপন জীবনের নির্দিষ্ট গণ্ডী থেকে উপচে পড়তে চায় এবং তার মধ্যে আশ্চর্য্য সার্থকতা লাভ করে। সেই উপচীয়মান বিশেষ আনন্দে সে উত্তীর্ণ হয়—"শুধু প্রাণধারণের শুধু দিন যাপনের গ্লানি"—।

কালের গতিতে পুরাণো চিন্তা পুরাণো ভাবকে অতিক্রম করে মানুষ পৌঁচচ্ছে নূতন নূতন ভাবে—নূতন নূতন দিক খুলছে চিত্তের। আজ তাই পুরাতন উৎসবগুলি পরিবর্তিত হয়ে যাচ্ছে।

বর্ষাকালে বর্ষা মঙ্গল, বসন্তে বসন্তোৎসব, নূতন পদ্ধতিতে প্রচলিত হচ্ছে—আর জন্মাষ্টমীর মতই পঁচিশে বৈশাখ বাংলা দেশে একটি উৎসবের দিন নির্দিষ্ট হয়েছে। উৎসবের এই দিনগুলি বিশুদ্ধ আর্টের মতই প্রয়োজনের গণ্ডীতে আবদ্ধ নয়। তার যে অকারণের আনন্দ তা চিত্তকে সৃষ্টি করে গঠন করে। শিল্পের মতই সে সৃষ্টি। মানুষের অন্তর্লোক সংসারের বাস্তবতাকে অতিক্রম করে তুচ্ছতাকে পার হয়ে প্রত্যেক দিনের দ্বন্দ্বকলুষ ভুলে অহেতুক রসে সিক্ত হয়ে অসীমে যুক্ত হয়। উৎসবের মূল্য তাই শিল্পের মতই অকারণের।

অবকাশ নৈলে মুক্তি নৈলে শিল্প ফোটে না, চিত্ত উদ্বুদ্ধ হ'তে পারে না। অতি কাছের যে জীবনে মানুষ অর্থ উপার্জন করে খায় দায় সংসার চালায় তারই কঠিন চাপে অন্তরের নির্বাসিত লোকে নিষ্পেষিত হয় আত্মা। সে মুক্তি খোঁজে রূপে রসে গানে সুরে উৎসবে আনন্দে। নৈলে তার আশ মেটে না। পেট ভরলেই জন্তু খুশী, কিন্তু মানুষ বলে এত অল্পে তার চলবে না—তার ভূমাকে চাই বৃহৎকে চাই যে বৃহৎ তার নিত্য প্রয়োজনের জৈবসীমাকে ছাড়িয়ে অবস্থিত। উৎসবের আয়োজনে তাই আছে সৃষ্টির আনন্দ, পাঁচজনকে নিয়ে রস সৃষ্টি। আগে এই পাঁচজন, আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধব খুব বড় হলে এক গ্রামের লোকজনের মধ্যে আবদ্ধ থাকত। ক্রিয়াকর্মে পূজা-পার্বণে পরিচিত ব্যক্তিরা মিলিত হতেন। আজকালকার উৎসব মৌখিক পরিচয় ও আত্মীয় বন্ধুর গণ্ডি পার হয়ে আরো দূরে ব্যাপ্ত

হয়েছে। গণ্ডী হয়েছে কৃষ্টিগত। আজকালকার এই সব উৎসবে সাধারণতঃ আমরা তেমনি ভাবে মিলিত হই যাঁরা এক একটি শিল্প ভাব বা চিন্তার পরিচয়ে মনে মনে বাঁধা। মৌখিক পরিচয় থাকুক বা না থাকুক। এই যে কৃষ্টিগত বন্ধন এই বন্ধন বহু দূর থেকে মানুষকে মনে মনে বাঁধে। তার দেশ কাল ও সময়ের সীমাকে লঙ্ঘন করে যায় এমনি এর সর্বব্যাপী আকাশগামী আলিঙ্গন। এই যে আজ আমরা সকলে একত্র হয়েছি আমরা কেউ কাউকে বড় একটা চিনিনে পরিচয়ও জানিনে। শুধু এই বিশেষ পরিচয়টুকু জানি যে আমরা সকলেই রবীন্দ্র সঙ্গীতের ভক্ত—আমরা রবীন্দ্র সঙ্গীতে আনন্দ পেতে 'শিখেছি'। 'শিখেছি' কথাটা বিশেষ করে বলবার প্রয়োজন এই জন্য যে সাধারণত সাহিত্য শিল্প ছবি গান এ সম্বন্ধে আমরা অতি সহজেই সমঝদার হয়ে উঠি। এর জন্যও শিক্ষার অপেক্ষা আছে। মনে হতে পারে গান শুনব তার আবার শিক্ষা কি—ভালো গান হলে ভাল লাগবে, নৈলে উঠে আসব। কিন্তু তা নয়। কোনো ভালো জিনিষই পথে পড়ে থাকে না, তা থাকে লুকানো মনিকোঠায়, সাধনার সিংহদ্বার পেরিয়ে তবেই রত্ন আহরণ করা যায়। একটি ভালো ছবি দেখে আনন্দ পেতে হলে, একটি ভাল গান শুনে উপলব্ধি করতে হলে, একটি ভালো সাহিত্যে রস পেতে হলে শিক্ষার অপেক্ষা থাকবেই, সে শুধু পুঁথিগত ইস্কুল কলেজি শিক্ষা নয়—সাংস্কৃতিক শিক্ষা। সংস্কৃতি বলতে কি বোঝায় তা নিয়ে বহু তর্ক বাদানুবাদ

চলতে পারে এবং চলে, কিন্তু মোটের উপর তার একটা অর্থ আমরা বুঝি—যে শিক্ষায় মানুষকে সমগ্র ভাবে গঠিত করে। কোনো একটি বিদ্যার বিশেষ অনুশীলনের দ্বারা যথার্থ culture হয় না। মনুষ্যত্বের সর্বাঙ্গীন উৎকর্ষ সাধনের দ্বারাই তা ঘটতে পারে। একজন পটুয়া যত ভালই পট আঁকুক, একজন শালকর তা সে যত ভালই নক্সা করুক, একজন ওস্তাদ যত ভালই সুরজ্ঞ হোক তার দ্বারা সে যথার্থ cultured বলে স্থির করা যায় না। তার বিচার শক্তি, মূল্যবোধ পূর্ণ জাগ্রত হয় না। মানুষের মন কত বিচিত্র পথে গিয়ে জ্ঞান আহরণ করেছে, কত রসানুভূতিতে সিক্ত হয়েছে ; কত দুর্গমে, কত গভীরে তার চিন্তার আরোহণ অবরোহণ ; সেই সমস্তকে নিয়ে সমগ্র অতীতের ছায়া ও প্রভাব পড়ে বর্তমান মানুষের জীবনে। তার যে দূর প্রসারী মন বহু বিচিত্র দিকে প্রসারিত তার মধ্যে সমস্তকে জড়িয়ে একটি মানব সত্ত্বা গড়ে উঠছে—অতীত থেকে বর্তমানে। সেই বৃহৎ মানব মানসে বৈচিত্র্য আছে, ভিন্নতা আছে অথচ তা যুক্তও বটে। আগেকার দিনে ভৌগোলিক সীমার মধ্যে আবদ্ধ হয়ে এক এক দেশে এক এক বিশেষ সভ্যতা ও সংস্কৃতি গড়ে উঠত। সেই সেই দেশে মানুষের মন যে ভাবে ভাবিত, যে রসে রসিত, যে চোখে জগৎ দেখত তারি ছাপ পড়ত শুধু যে তার কাব্যে সাহিত্যে দর্শনে ভাস্কর্যে তা নয়। তা তার প্রত্যহের ব্যবহার্য মাটির পাত্রের নকসাতে, তা তার জিনিষপত্রে, তা তার চলনে বলনে, সংসারে সমাজে জীবনের প্রতিটি ভঙ্গীতে জড়িত হত। সে সেই সেই দেশের বিশেষ

সংস্কৃতির ফল। আজ সমগ্র জগৎ কাছাকাছি এসেছে—দেশগত দূরত্ব অপসারণের মুখে, তাই সমগ্র মানব জাতির মধ্যে এক সংস্কৃতি গড়ে উঠবার কিংবা এক ধ্বংস অভিমুখে ধাবিত হবার চেষ্টা দেখা যাচ্ছে। যে শিক্ষা মানুষকে একটি বিশেষ বিষয়ে মাত্র কুশলী করে তোলে সে শিক্ষা যতই গভীর হোক তা আংশিক, কিন্তু যে শিক্ষার দ্বারা মানুষ সর্বতোভাবে জাগ্রত হয়ে ওঠে, তার মন বুদ্ধি সংকল্প অনুভূতি উপলব্ধি সমস্ত প্রবুদ্ধ হয়, সেই সব দিক থেকে মানুষকে জাগিয়ে তোলাই যথাথ শিক্ষা। বিজ্ঞান জগতে মানুষের আংশিক শিক্ষা লাভ করা ছাড়া উপায় নেই, কিন্তু সাহিত্য আছে তার মনকে জাগাতে — মানব চিত্ত সমুদ্র মন্থন করে এনে দিতে সেই অমৃত, যার ফলে সে উত্তীর্ণ হয় প্রজ্ঞায়, সত্য উদ্ভাসিত হয় তার উপলব্ধিতে।

সেই জন্য যে কোনো শিল্পের যথার্থ মর্য্যাদা দিতে হলে প্রজ্ঞার প্রয়োজন শিক্ষার প্রয়োজন, ভাল লাগার একটি অস্পষ্ট বোধ সেজন্য পর্য্যাপ্ত নয়।

আজকাল রবীন্দ্র সঙ্গীত প্রচলিত হয়েছে। অনেকেই শুনে আনন্দ পান নৈলে গাইবেন কেন। তবে এও বহুদিনের অভ্যাস ও শ্রুতিসাধনার ফলে ঘটেছে। তবুও দুঃখের সঙ্গে লক্ষ্য করেছি অনেক সময়ই গায়ক গায়িকার অর্থ বোধ হয় না। তার ফলে পাঠে অমার্জনীয় ভুল থাকে। একবার 'পঁচিশে বৈশাখ' গানে 'ব্যক্ত হোক জীবনের জয়'কে 'ব্যর্থ হোক জীবনের জয়' শুনে মর্মাহত হয়েছিলুম। গায়িকা সুকণ্ঠী এবং একটি বিশিষ্ট

প্রতিষ্ঠানের ছাত্রী। তথাপি এমন সব ভুলও ঘটে। এই দুটি লাইনের তাৎপর্য্য

"ব্যক্ত হোক জীবনের জয়।
ব্যক্ত হোক তোমা মাঝে অসীমের চির বিস্ময়।"

বুঝতে হলে এবং এতটুকুও উপলব্ধি করতে হলে রবীন্দ্র সাহিত্যের সঙ্গে গভীর যোগ থাকা একান্ত প্রয়োজন। রবীন্দ্রকাব্যের একটি অতি বিরাট তত্ত্ব ওই দুটি লাইনে গুহাহিত হয়ে আছে। তার সঙ্গে যদি পরিচয় হয় তবে সুর ছন্দ ও কাব্য মহিমায় মন যে গভীরতায় পূর্ণ হবে তা বিনা অর্থ বোধে হতেই পারে না। বলতে পারা যায়, অত কথায় কাজ কি বিশুদ্ধ সুরে গাইলেই গানের সার্থকতা। সঙ্গীত তো স্বাধীন, সে তো উড়তে পারে, "মেলি দিয়া সপ্ত সুর সপ্ত পক্ষ অর্থভারহীন।"—তা একরকমে বটে কিন্তু 'রবীন্দ্র সঙ্গীত' সম্বন্ধে এ কথা সম্পূর্ণ খাটে না তার মধ্যে যে বিরাট ভাবসমুদ্র চিত্তশক্তির লীলায় লীলায়িত তারি সঙ্গে সম্মিলনে সুরের পূর্ণ সার্থকতা। যেমন—যদি জ্যোৎস্না-প্লাবিত রাত্রে দরজা জানালা বন্ধ করে বসে থাকি তবু তার বদ্ধ দ্বারের রন্ধ্র দিয়ে রজনীগন্ধার মৃদু সৌরভ আসে, সে পুষ্প সৌরভই বটে, তাতে মন আমোদিত হয়। কিন্তু তার পর যদি হঠাৎ রুদ্ধ দ্বার খুলে যায় আর জ্যোৎস্নাধৌত শুভ্রতায় উচ্ছ্বসিত পুষ্পগুচ্ছ দেখতে পাই তখন যেমন হয়, রবীন্দ্র সঙ্গীতে অর্থ বোঝা না বোঝায় তেমনি পার্থক্য ঘটবে। সুরের যে লীলা তরঙ্গ ভাষাহীন ব্যাকুলতায় মনকে উদ্বেলিত করে, গভীর অনুভূতির মধ্যে,

সার্থক হয়—কথা সেখানে অনেক সময়ই প্রয়োজনীয় নয়—কিন্তু যেখানে কথা ও সুর দুই'এর মিলিত সংযোগ মনকে বিশেষ ভাবে উদ্বেলিত করতে পারে সেখানে হৃদয় মন ও বুদ্ধির ঐক্যতানে সম্পূর্ণ হয় সঙ্গীত—বিশেষ করে রবীন্দ্র সঙ্গীত—যা কখনো বর্ষা বসন্ত উষা সন্ধ্যার নানা বাণী মুখরিত যা কখনো প্রেম ও ভক্তির গাঢ়তায় নিমগ্ন। সেই এক একটি গান এক একটি উপাসনা। যেমন—

"বসন্তের এই ললিত রাগে
বিদায় ব্যথা লুকিয়ে জাগে
ফাগুন দিনে গো কাঁদন ভরা হাসি হেসেছি।"

এই দুটি লাইনে জন্ম মৃত্যুর লীলা তরঙ্গ, দুঃখ সুখের গভীর প্রবাহ যা প্রকৃতি ও মানব-জীবনে প্রবাহিত সেই তত্ত্ববাণীই ছন্দ ও সুর-মাধুর্য্যে ললিত হয়ে মনের পরদায় আঘাত করে। তাতে একসঙ্গে মন উত্তীর্ণ হয়—কল্পনা, ধ্যান ও উপলব্ধির রসলোকে তার যোগ ঘটে বিশ্বপ্রকৃতির অন্তর্নিহিত গভীর রহস্যের সঙ্গে, যার সন্ধানে মানব চিত্ত নানা ভাবে অনুসন্ধানী।

তত্ত্বের ও সত্যের যে উদ্ঘাটনের জন্য মানুষের মন কাঁদে, মানুষ জানতে চায় যে গভীরকে, যে রহস্যকে, বুঝতে চায় জগতের মর্মকথা, উপলব্ধি করতে চায় বিরাটের যে অস্তিত্ব ধ্যানে, সেই অতল স্পর্শ বিশ্বসত্য রবীন্দ্রসঙ্গীতের মাধ্যমে বিদ্যুৎ চমকের মত তার হৃদয় আলোকিত করতে পারে এবং

সেই হৃদয়ে উপযুক্ত সমিধ্ ইন্ধন পেলে সে পাবক শিখা উর্দ্ধমুখী হোমাগ্নি হয়ে জ্বলতে পারে। এই বিরাট সম্ভাবনা এনেছে রবীন্দ্র সঙ্গীত বাংলা দেশে।

এ নিয়ে বহু আলোচনা চলতে পারে। মোটের উপর একথা স্মরণ রাখতে হবে যে রবীন্দ্র সঙ্গীত শুধু নয় সমস্ত শিক্ষাই যদি আমরা জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠা না করি তবে তার মহিমা পদে পদে ক্ষুণ্ণ হয়। আজ এই কলকাতা সহরে ছোট বড় নানা সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। তাদের মধ্যে যদি একটি যোগ থাকত—তাহলে এ সাধনা সাধ্য হত। শুধু ছ'একটি গানের জলসা করতে পারলেই সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের কর্তব্য শেষ হয় না। কী করলে হয়—কী করলে মানুষ সমগ্রভাবে মানুষ হয়ে ওঠে সে বিষয়ে বিশেষ বিবেচনা করে নানা জ্ঞানের অনুশীলন এই সব প্রতিষ্ঠানের মধ্যে প্রচলিত হওয়া উচিত। আজকের দিনে দেশ যখন অন্ন বস্ত্রের হাহাকারে ছুর্ভিক্ষের তাড়নায় কালোবাজারের তপ্ত বাতাসে আর পোলিটিক্যাল ঝগড়ার ঘূর্ণীতে পাক খেতে খেতে জীবন যাত্রা সমাপ্ত করতে বসেছে, তখন এই সব প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন আরো গভীর হয়েছে। এরাই তার অন্নগত ক্ষুধিত দেহকে স্মরণ করিয়ে দেবে যে মানুষ এর চেয়ে বড়। মানুষ যাবে তার রক্তমাংসকে পেরিয়ে সুরের অমরাবতীতে, রসের আনন্দলোকে। কর্দমাক্ত পিচ্ছল গলিত সহরের অপরিচ্ছন্ন পথ যার পাশে পরিষ্কার হয়না ডাষ্টবীন, মেরামত হয় না গর্ত, হোঁচট খেয়ে

চলতে হয় খুবলে যাওয়া পিচে,—অর্দ্ধভুক্ত জীর্ণ দেহের ক্রন্দন বহন করে। তবু সেই কর্দমাক্ত পিছল পথ দিয়ে ট্রামে বাসে ভীড় ঠেলাঠেলি করে রুদ্ধশ্বাস হয়ে যেতে যেতে শীর্ণ তার বুকের ভিতর এই সব প্রতিষ্ঠানই বাজাবে জলদমন্দ্র সুর—সে পার হয়ে যাবে তার চার পাশের পঙ্কিল আবহাওয়া, পৌঁছবে যেখানে আকাশের কোণে ঘন বর্ষার মেঘ পুঞ্জীভূত। পৌঁছবে কালিদাসের অমরাবতীতে, যেখান থেকে যূঁথী পরিমল আসিছে সজল সমীরে —তার আত্মার রহস্যলোক থেকে উৎসারিত হয়ে উঠবে কী আশ্চর্য্য অনুভূতি—আবার এসেছে বর্ষা তার প্রিয়তমা ধরণীকে শ্যামল করতে।

রামমোহন লাইব্রেরীতে পঠিত।

আবৃত্তি

আজ যে বিষয়ে বলতে অনুরুদ্ধ হয়েছি এ বিষয়ে আলোচনার প্রয়োজনীয়তা দীর্ঘদিন ধরে আমার মনে আলোড়িত হচ্ছে। অপ্রত্যাশিত ভাবে এই আহ্বান পেয়ে সেজন্য অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছিলুম। বাংলা ভাষায় রবীন্দ্র সাহিত্যের আবির্ভাবের পর আবৃত্তি একটি বিশেষ শিল্প হয়ে উঠবার সুযোগের সম্মুখীন হয়েছে। অবশ্য এই সুযোগ এখনও পূর্ণভাবে গ্রহণ করা হয়নি। যেমন রবীন্দ্র সঙ্গীত একটি বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছে দেশের চিত্তে তেমনি রবীন্দ্র কবিতা আবৃত্তি ও গদ্য সাহিত্য পাঠও একটি বিশেষ সৃষ্টি হয়ে উঠতে পারে। রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠে যাঁরা তাঁর সাহিত্য শোনবার সৌভাগ্য লাভ করেছেন তাঁরা জানেন যে, যে কবিতা গল্প বা নাটক আমরা নিজেরা বহুবার পাঠ করেছি সেই রচনাই তাঁর কণ্ঠে অন্যরূপ নিয়েছে! সে যেন একটি অন্য সৃষ্টি কণ্ঠস্বরের আন্দোলনে যেন তার ব্যাখ্যা হয়ে গেল! বিশুদ্ধ উচ্চারণের যোগে তার সৌন্দর্য্য হল পূর্ণতর। ব্যাখ্যা হয়ে গেল বলতে এই কথাটি বোঝাতে চাই যে আবৃত্তি-কালীন স্বরের ভঙ্গীর দ্বারা অর্থের বোধকে শ্রোতার মনে জাগ্রত করে তোলা, তাকে অনুভব করানো।

এই প্রসঙ্গে মনে পড়ছে একবার বরাহনগরের বাড়ীতে কবি রক্তকরবী রূপকটি পড়ে শুনিয়েছিলেন বিশ্বভারতীর সভ্যবৃন্দের কাছে। সমবেত শ্রোতৃমণ্ডলী সভাস্থ হয়েছেন—মৃদু স্বরে অপেক্ষমান জনতা গল্পগুজব করছেন—কবি চৌকির উপর বসে বইখানি হাতে নিয়ে পাতা উল্টে যাচ্ছেন এমন সময়ে, একেবারে হঠাৎ বইটির নাম পড়ে বা কোনোরকম ভণিতার দ্বারা শ্রোতাদের প্রস্তুত হতে না দিয়ে হঠাৎ যেন ডেকে উঠলেন—নন্দিনি ! নন্দিনি ! নন্দিনি !,—আমরা চমকে উঠলুম। এক মুহূর্ত সময় লাগল বুঝতে যে রক্ত করবী পড়া সুরু হয়ে গেছে। সে কেবল মাত্র পড়া নয়, কিশোর যে কণ্ঠে নন্দিনীকে ডেকেছিল সে সেই আনন্দ আহ্বান। রক্ত করবী সোজা বই নয়। ওর মধ্যে লুকান যে গভীর অর্থ তা যেন প্রথমেই উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। মানুষের যে অকারণ আনন্দ প্রয়োজন সিদ্ধির বন্ধন এড়িয়ে বিশ্বে পরিব্যাপ্ত হচ্ছে—যে কারণহীন আনন্দে তার জীবনের সার্থকতা সেই তার আনন্দ উদ্বেলিত চিত্ত যন্ত্রপুরীর কারাগার উত্তীর্ণ হয়ে যাবে। "আর সব বাঁধা পড়লেও যে আনন্দ বাঁধা পড়ে না" মানব হৃদয়ের সেই অকারণ লীলার আবেগ রক্ত করবীর যে একটি প্রধান কথা, সেদিন পড়া আরম্ভের সূচনাতেই প্রথম লাইনেই আশ্চর্য্য ভাবে প্রকাশিত হল।

যে কথা বহু ব্যাখ্যার দ্বারা বোঝাতে হয়, তা আবৃত্তি কারকের মনের অনুভবের যোগে শ্রোতার মর্মে সহজে প্রত্যক্ষ করান চলে এ আমরা সেদিন অনুভব করেছি।

তাই বলছিলুম আবৃত্তি একটি বিশেষ শিল্প হ'য়ে উঠতে পারে। হয়ে উঠতে পারে একটি বিশেষ সৃষ্টি, যদি এ বিদ্যার যথাযথ অনুশীলন ঘটে।

দুটি প্রধান বিষয়ে আমি বলতে অনুরুদ্ধ হয়েছি। একটি আবৃত্তির জন্য বয়সোপযোগী কবিতার নির্বাচন ও আবৃত্তি শিক্ষার পদ্ধতি। যথোপযোগী কবিতা নির্বাচন ও ভালো আবৃত্তির মূলে চাই পাঠকের কবিতা বুঝবার ক্ষমতা। সমস্ত বিষয়টি মনের মধ্যে পরিষ্কার হলে ও অনুভবে প্রবেশ করলে তবেই আবৃত্তি কারক তাঁর শ্রোতাদের সেইভাবে অনুভাবিত ও সেই রসে সিক্ত করতে পারেন। বিশেষত রবীন্দ্রকাব্যে চিন্তার যে সূক্ষ্ম লীলা অনির্বচনীয় রস সিক্ত হয়ে পরতে পরতে গভীর হয়ে গিয়েছে, মনের সামনে তার একটি একটি করে পরদা উত্তোলনে পাঠকের সাধন লব্ধ সম্পদ লাভ ঘটে।

এই প্রসঙ্গে শিশুর 'জন্মকথা' নামে অতি পরিচিত কবিতাটী পড়ছি—এই কবিতা দশ বছর বয়স থেকে পড়ে এসেছি—জীবনের প্রতি ধাপে ধাপে এর গভীর থেকে গভীরতর নূতন নূতন অর্থ ব্যক্ত হয়েছে। শিশুর এই কবিতা শিশুর কাছে ব্যর্থ নয়, এমন কি আবৃত্তির অনুপযোগীও নয়, তবু যুবতী নারীর হৃদয়ে এর গভীর রস সঞ্চার—আর জননীর চিত্তেই প্রকাশিত এর পূর্ণতর ব্যাখ্যা। এই কবিতা ক্রমে ক্রমে নারী জীবনের ধাপে ধাপে অভিব্যক্ত।

মোটের উপর এই কবিতা শিশুর চেয়ে শিশু-জননীরই নিজস্ব। "শিশু ভোলানাথ" বা "শিশু"র অধিকাংশ কবিতাই তার পিতামাতার মনের কথা। "বীরপুরুষ", "ছেলেমানুষ", "লুকোচুরি", "সমালোচক", "সমব্যথী", "তালগাছ", "সময়হারা" ইত্যাদি অনেকগুলি শিশুদের আবৃত্তি করবার উপযুক্ত কবিতা বিশেষ প্রচলিত। "শিশু ভোলানাথে"র "রাজারাণী" নামে কবিতাটী আমি বিশেষ কখনো কোনো ছোট ছেলেমেয়ের মুখে শুনিনি, যদিও আমার মনে হয় শিশুদের মনের কাছে তার অতি ঘনিষ্ঠ সংসারের একটি প্রত্যহ দেখা এবং তার ছোট হৃদয়ের বেদনা আনন্দ জড়িত অতি আশ্চর্য্য শিশু সাহিত্য ঐ ছোট্ট কবিতাটির মধ্যে লুকানো আছে। তার ক্ষুদ্র জীবনের "রাজা রাণী"র কর্ত্তা কর্ত্রীর মধ্যে এই অভিনয়ে সে হয়ত সাজার দুঃখও অনেক ভুলতে পারে।

কবিতার অর্থ যত উপলব্ধি ও অনুভবের কাছে আসে তত আবৃত্তি সহজ ও স্বাভাবিক হয়। এজন্য নির্বাচনের সময় এ বিষয়ে লক্ষ্য রাখা প্রধান কর্তব্য। একবার একটি বড় গভর্ণমেণ্ট স্কুলের পুরস্কার বিতরণী সভায় ১০।১১ বছরের একটি ফিফথ্ ক্লাসের ছেলেকে "বলাকার" "দান" কবিতা আবৃত্তি করতে শুনেছিলাম।

"হে বন্ধু কী চাও তুমি দিবসের শেষে
মোর দ্বারে এসে?

কী তোমারে দিব আনি।
সন্ধ্যা দীপ খানি ?

এ দীপের আলো এ যে নিরালা কোণের
স্তব্ধ ভবনের।

তোমার চলার পথে এরে নিতে চাও জনতায় ?
এ যে হায়
পথের বাতাসে নিবে যায়॥”

এই অনির্বচনীয় সুন্দর কবিতাকে কিন্তু ঐটুকু ছেলের মুখে হাস্যকর ঠেকেছিল। যথেষ্ট পরিশ্রম করে তাকে শেখান হয়েছিল বোঝা গেল। গলার স্বর অশ্রুর আভাসে অবরুদ্ধ ও যথেষ্ট কারুণ্য সহকারে পড়া সত্ত্বেও ওই অপূর্ব কবিতাটি তার caricature হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ওই বয়সের উপযুক্ত এবং যে কোনো বয়সের পক্ষে আবৃত্তি করবার একান্ত উপযুক্ত বিশেষ প্রসিদ্ধ “বন্দীবীর”, “গুরুগোবিন্দ”, “অভিসার”, “দেবতার গ্রাস”, প্রভৃতি শুনেও অনেক সময় দুঃখিত ও চিন্তিত হতে হয়েছে। একদিন “দেবতার গ্রাস” আবৃত্তি করবার সময় আবৃত্তি-কারক সমস্ত ব্যাপারটাই অভিনয়ে রূপান্তরিত করে তুলেছিলেন—শেষ পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণের ঝম্প প্রদানে ষ্টেজ কেঁপে উঠেছিল। অথচ আমাদের মতে অতখানি অভিনয়ে আবৃত্তির সঙ্গতি ও সৌকুমার্য্য ক্ষুণ্ণ হয়। অর্থবোধেরও সাহায্য হয় না। কেবলমাত্র গলার স্বরের হ্রস্বদীর্ঘের সাহায্যেও অর্থের নিঃসংশয় উপলব্ধির প্রকাশের দ্বারা

আবৃত্তি জীবন্ত করা চলে। "দেবতার গ্রাস" কবিতাটির মধ্যে সবচেয়ে যেখানটি শিশুদের পক্ষে বোঝা কঠিন—

"জল শুধু জল,
দেখে দেখে চিত্ত তার হয়েছে বিকল।
মসৃণ চিক্কণ কৃষ্ণ কুটিল নিষ্ঠুর,
লোলুপ লেলিহজিহ্ব সর্পসম ক্রূর
খল জল ছলভরা মেলি লক্ষ ফণা
ফুঁসিছে গর্জিছে নিত্য করিছে কামনা
মৃত্তিকার শিশুদের, লালায়িত মুখ।
হে মাটি, হে স্নেহময়ী, অয়ি মৌনমূক,
অয়ি স্থির, অয়ি ধ্রুব, অয়ি পুরাতন,
সর্ব-উপদ্রব-সহা আনন্দ ভবন
শ্যামলকোমলা, যেথা যে কেহই থাকে
অদৃশ্য দু বাহু মেলি টানিছ তাহাকে
অহরহ, অয়ি মুগ্ধে, কী বিপুল টানে
দিগন্ত বিস্তৃত তব শান্ত বক্ষ-পানে।"

—একটি আট বছরের ছেলেকে বিশেষ করে এইখানটা শুনিয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলুম। সে বললে—জলকে এত ভয়ানক আর নিষ্ঠুর বলা হয়েছে কারণ রাখাল আর একটু পরেই জলে ডুবে মরে যাবে—আর মাটিতে একবার দাঁড়াতে পারলে মানুষ তো বাঁচে। মাটি মায়ের মত বুকের কাছে টানছেন সে তো নিশ্চয়—পৃথিবী তো সব কিছুকেই টানছে। সেই যে আপেল ফলটা

পড়েছিল সেই কথাটা বোধ হয় !!" আমি বিস্মিত হয়েছিলুম। এই জটিল বর্ণনাটির মধ্যে অর্থের যে দ্বৈত খেলা আছে, দু একবার পড়বার পর ঐটুকু শিশুর কাছে তা স্পষ্ট হয়েছিল। রবীন্দ্র কবিতায় সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম নানাভাবের লীলা আছে—আবৃত্তিকারক ও শিক্ষক যদি তার রস অনুভব করতে পারেন তবে তাঁর পড়ার ভিতর দিয়ে সেই অনুভবের আনন্দ সহজেই শ্রোতার মধ্যে সঞ্চারিত হবে, সেজন্য কৃত্রিম জোর দেওয়ার প্রয়োজন হয় না। যদিও এ বিষয়ে গুরুতর মত ভেদ হবে, কারণ শুধু বালকবালিকারাই নয়, বয়স্ক ব্যক্তিরাও অনেকে অঙ্গ ভঙ্গীর পক্ষে। সম্প্রতি একজন প্রসিদ্ধ আবৃত্তিকারকের মুখে "বর্ষশেষ" কবিতাটি শুনেছিলুম—ষ্টেজে দাঁড়িয়ে তিনি পড়লেন—কখনো সামনে এগিয়ে এলেন, কখনো পিছিয়ে গেলেন, তাঁর মাথা উৎক্ষিপ্ত, হাত আন্দোলিত হ'তে লাগল, মনে হল ভীষণ একটা কাণ্ড চলেছে—এত বেশী ভাবাতিশয্যের আঙ্গিক প্রকাশে রসের বিঘ্ন ঘটে, আবৃত্তির মহিমা নষ্ট হয়ে যায়। তবে একথাও ঠিক যে অর্থ এবং ছন্দের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে স্বরের ওঠানামা একান্ত প্রয়োজন, তা না হলে অনির্বচনীয় রচনাও একঘেয়ে বোধ হতে পারে। আমার নিজের মনে হয়, এমন কোনো ভালো কবিতা বা উচ্চ সাহিত্য নেই যা আবৃত্তি করা চলে না। রবীন্দ্রনাথের অনেক গানও নিঃসন্দেহে আবৃত্তি করা যেতে পারে এবং সেগুলি কবিতাই বটে—তবুও ছন্দের বিশেষত্ব ও ভাবের বৈচিত্র্য অনুসারে আবৃত্তির কবিতার

মধ্যে নিঃসংশয়ে নির্বাচন চলে। যে কবিতায় নানা রকম ভাবের খেলা আছে, ছন্দের দোলা আছে, যেমন "বর্ষশেষ", "সুপ্রভাত", "সাজাহান", "ঝুলন" ইত্যাদি—আবৃত্তি কারকের কণ্ঠ তার মধ্যে সহজে লীলায়িত হতে পারে—একটানা ছন্দ বা একটানা ভাবের কবিতায় তা তেমন হবে না।

কবিতা নির্বাচনের সময় তাহলে এই দুটি বিষয়ে লক্ষ্য রাখতে হয় যে, আবৃত্তি কারকের চিত্ত সেই রচনার ভাবে অনুভাবিত হতে পারে কি না। শুধু বয়সের তারতম্য অনুসারে নয়—শিক্ষা, রুচি, অনুধাবন শক্তির সঙ্গে মিলিয়ে উপযুক্ত রচনার নির্বাচন করা উচিত। দ্বিতীয়ত, উপলক্ষ্যের সঙ্গেও যথোপোযোগিত্ব চাই সে কথা বলাই বাহুল্য।

অল্পবয়সের ছেলে মেয়েদের আবৃত্তির উপযুক্ত কতগুলি কবিতার উল্লেখ করতে আমায় বলা হয়েছিল—আমার নিজের মনে হয় এ সম্বন্ধে ফর্দ তৈরী করতে গেলে অসম্পূর্ণ হবে। বিরাট রবীন্দ্র সাহিত্য পূর্ণ হয়ে আছে সম্পদে—সময় ও ক্ষেত্র উপযোগী সাহিত্য খুঁজে পাওয়া কঠিন নয়। শুধু এই কথা বলব, সুপরিচিত অতুলনীয় "কথা ও কাহিনী", "শিশু ভোলানাথ" ইত্যাদি বই থেকেই বালক বালিকাদের আবৃত্তি করান হয়—কিন্তু "ছড়া ও ছবি", "ছড়া", "প্রহাসিনী", "খাপছাড়া" ইত্যাদির মধ্যেও বালক বালিকাদের আবৃত্তির উপযুক্ত কবিতা রয়েছে। সেগুলি আড়ালে রয়েছে, সামনে এলে শ্রোতারা আনন্দ পাবেন।

কবিতা নির্বাচন সম্বন্ধে এ পর্য্যন্তই থাক। এর পরে আলোচনা করা যাক আবৃত্তি শিক্ষার পদ্ধতি সম্বন্ধে। এ বিষয়ে যে ত্রুটি প্রথমেই লক্ষ্য হয় সে উচ্চারণের অশুদ্ধি। বস্তুত বাংলা উচ্চারণের নির্দিষ্ট মাপকাঠি নির্ণীত হয়েছে কিনা জানিনা। প্রাদেশিকতার দ্বারা বাংলা উচ্চারণ আচ্ছন্ন হয়ে আছে। যদিও সংস্কৃতই বাংলা ভাষার প্রধান আশ্রয়, তবু বাংলায় সংস্কৃত উচ্চারণ অনুসরণ করে চলা সর্বদা সম্ভব নয়। লক্ষ্মী আমাদের লক্ষ্মীই বটে লক্‌সমী নয়—কিন্তু আত্মা 'আঁত্তা' না হয়ে 'আঁত্‌মা'ও হতে পারে এবং বোধ হয় হলেই ভালো। আমরা বাঙ্গালীরা ঋফলার উচ্চারণ জানিনে, 'ঋ' ফলা সর্বদাই 'র' ফলা হিসাবে ব্যবহার করে থাকি। গুরুদেব সর্বদা পরিহাস করে বলতেন, "বাঙালীরা আবৃত্তি করে না, করে আব্রিত্তি—অমৃত হয় অম্রিত—পিতৃ হয় পিত্রি, মাতৃ মাত্রি। তার উপর আমাদের খামখেয়ালী 'অ'র যেখানে সেখানে উল্টো পাল্টা ব্যবহার। পূর্ববঙ্গের রসনায় 'বন' 'মন' 'পণ' আমাদের দক্ষিণী বাঙ্গলায় বোন মোন ইত্যাদি—পূর্ববঙ্গের কথায় লক্ষ লক্ষ দক্ষ যজ্ঞ আমাদের যদিও—লোক্ষ লোক্ষ চলে কিন্তু দোক্ষ যোজ্ঞ না হয়ে দক্ষ যজ্ঞ হওয়াই বাঞ্ছিত।

যদিও বোক্ষ না শুনে ব (অ) ক্ষ শুনলে আমাদের বক্ষ কম্পিত হয় তবুও র(অ)ক্ত না বলে রোক্ত বলব না নিশ্চয়। এর কি ও কেন নিয়ে আলোচনা করবার উপযুক্ত সময় এখানে হবে না। কিন্তু বাংলা উচ্চারণের এই অত্যন্ত খামখেয়ালীত্ব

সত্ত্বেও একটি অকথিত নিয়ম নিশ্চয় আছে এবং সে নিয়ম সংস্কৃত উচ্চারণের অর্থাৎ বাংলা ভাষার মাতৃ শরীরেই লগ্ন।

বোন জঙ্গল না বলে বঅ ন জঙ্গল বললে আমাদের দক্ষিণ দেশের লোকের কানে যতই কটু শোনাক, সংসারকে সোংসার বলার চাইতে তা নিঃসন্দেহে কম ভুল। নমস্কারকে নোমোস্কার এবং যম যদি হয়ে ওঠে যোম তবে সে ভাষার কৃতান্ত রূপেই আসে। একবার একটি প্রসিদ্ধা গায়িকাকে গাইতে শুনেছিলাম—একটি নোমোস্কারে প্রভু একটি নোমোস্কারে সকল দেহ লুটিয়ে পড়ুক তোমার এ সোংসারে! সুরের সেই অপূর্ব মহিমার মধ্যে উচ্চারণের এই বিকৃতি মর্মে কাঁটার মত বিদ্ধ হয়েছিল। যেমন পূর্ববঙ্গের প্রাদেশিকতা—দুষ্ট উচ্চারণ কেবলকে ক্যাবল—লেখাকে ল্যাখা—কাব্যকে কাইব্য ইত্যাদি সহনীয় নয় তেমনি কলকাতার দিকের ভাষার কথা কে কতা, ছাখোনিকে ছ্যাকোনি, ভিতরেকে ভেতরে, সংসারকে সোংসার, বন্ধকে বন্দ ইত্যাদি একেবারে অচল। মোট কথা উচ্চারণের সময় যতটা সম্ভব লেখার সঙ্গে ও মূল সংস্কৃত উচ্চারণের সঙ্গে মিল রাখতে পারলেই বোধ হয় ভালো। বিশেষ করে যে শব্দগুলি সংস্কৃত রূপেই আছে বাংলায় যা ঘরোয়া নয়। আমাদের বাংলা উচ্চারণে সব অ ই হসন্তান্ত হ'য়ে যায় শেষে থাকলে। হলন্ত উচ্চারণ নেই বললেই চলে—যেমন নর্অ হয় নর্, শিব্অ হয় শিব্, সাবলীল্, তাই বলে লীলায়িত্ চলবে না সেটা লীলায়িত (অ) বটে। শিব্ বটে কিন্তু—'শিব(অ) রাত্রি' শোনায় ভালো

শিব্‌শঙ্করের চেয়ে 'শিব(অ) শঙ্কর' শুদ্ধতর। সমাসবদ্ধ পদে এটা বেশী দেখা যায় যেমন যদিও প্রাণ (অ) কখনো বলিনে বলি প্রাণ্‌ কিন্তু 'প্রাণ (অ) স্বরূপ'। যে শব্দগুলি ঘোর বাঙ্গালী হয়ে যায়নি সেগুলির সংস্কৃত উচ্চারণ রাখাই সঙ্গত। একবার স্কুলে একটি ছোট মেয়ে দ্রোণ (অ) বলে বকুনি খেয়েছিল। মাষ্টার দিদি সংশোধন করে দিলেন দ্রোণ্‌ !

ব বাঙ্গলায় 'ওয়' নয় বটে তবু জিহ্বা, জিব্ভা নয়। তার মধ্যে 'হ' এবং 'ওয়' দুটি শব্দই আছে। আহ্বান, আব্ভান নয়। এটা জিহ্বার জড়তা—দুষ্ট উচ্চারণ ছাড়া আর কিছুই নয়। এ বিষয়ে আলোচনায় প্রচুর মতদ্বৈধ হবার সম্ভাবনা এবং আমিও নিজেকে যথেষ্ট পারদর্শী বলে মনে করিনে—তবু আবৃত্তি প্রসঙ্গে যতটুকু দরকার সেইটুকু এখানে সংক্ষেপে আলোচনা করা গেল। প্রাদেশিকতার প্রভাবমুক্ত হয়ে মোটের উপর মূল উচ্চারণের বিশুদ্ধি রক্ষা করে পরিষ্কার জড়তাহীন উচ্চারণ ও কিছু পরিমাণে হ্রস্বদীর্ঘর নিয়ম পালন আবৃত্তির সৌষ্ঠব ঘটায়। যদিও বাঙ্গলায় হ্রস্ব দীর্ঘ উচ্চারণের পার্থক্য নেই—গতি ও নদী, সুর ও দূর একই প্রায়, তবু যদি বলা যায়, এনেছি তির্থ বারি তার চেয়ে এনেছি তীর্থ বারি—শুদ্ধ শোনাবে।

দূরে বহু দূরে স্বপ্নলোকে উজ্জয়িনী পূরে
খুঁজিতে গেছিনু কবে শিপ্রানদী পারে
মোর পূর্ব জনমের প্রথমা প্রিয়ারে—

এখানে দূরে যদি পরিষ্কার ভাবে দীর্ঘ ঊ কার দিয়ে পড়া

যায় তবে সেই দূরত্ব অনুভবে প্রবেশ করে সহজে। যা দুরে বহু দুরে পড়লে হবেনা।

শুদ্ধ উচ্চারণ ছাড়াও আর একটি যে বিশেষ দিকে আবৃত্তি-কারকের, বিশেষ করে কবিতা আবৃত্তি-কারকের স্মরণ রাখতে হয় সে ছন্দের গতি। কাব্য তার ছন্দস্পন্দনের চলদ্ বেগে আমাদের চৈতন্যকে গতিমান্ আকৃতিমান্ করে তুলছে নানা ভাব চাঞ্চল্যে, ঠিক যেমন অদৃশ্য চঞ্চলা কাল নদী তার কায়াহীন বেগের দ্বারা, তার অদৃশ্য প্রবাহের দ্বারা দৃশ্যমান করে তুলছে নানা বস্তু। কাল ছাড়া কোনো বস্তুই প্রত্যক্ষ হয় না অথচ সেই মহাকালের দৃশ্যমান রূপ নেই—

স্পন্দনে শিহরে শূন্য তব রুদ্র কায়াহীন বেগে
বস্তুহীন প্রবাহের প্রচণ্ড আঘাত লেগে,
পুঞ্জ পুঞ্জ বস্তু ফেনা ওঠে জেগে।

তেমনি যেন ছন্দের অদৃশ্য গতি প্রবাহের মাধ্যমে ফুটে ওঠে অসংখ্য ভাব এবং তা যেন লাভ করে সেই বেগ—যতটুকু তত্ত্ব আছে খবর আছে তাকে অতিক্রম করে সে চলেছে যে নিরুদ্দেশ —সেই চলা তাহার রাগিণী! রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন "ছন্দর সঙ্গে অছন্দর তফাৎ এই যে, কথা একটাতে চলে আর একটাতে শুধু বলে, কিন্তু চলে না। যে চলে সে কখনো খেলে কখনো নাচে কখনো লড়াই করে হাসে কাঁদে। যে স্থির বসে থাকে সে আপিস চালায় তর্ক করে বিচার করে হিসাব দেখে দল পাকায়—ব্যবসায়ীর শুষ্ক প্রবীণতা ছন্দোহীন বাক্যে—অব্যবসায়ীর সরস

চঞ্চল প্রাণের বেগ ছন্দোময় ছবিতে গানে কাব্যে। এই ছবি গান কাব্যকে আমরা গড়ে তোলা জিনিষ বলে মনে করিনে এ যেন হয়ে ওঠা পদার্থ।”..........

“গদ্যে প্রধানত অর্থবান শব্দকে ব্যূহবদ্ধ করে কাজে লাগাই, পদ্যে প্রধানত ধ্বনিমান্ শব্দকে ব্যূহবদ্ধ করে সাজিয়ে তোলা হয়। ব্যূহ শব্দটা এখানে অসার্থক নয়। ভিড় জমে রাস্তায় তার মধ্যে সাজাই বাছাই নেই কেবল এলোমেলো চলা ফেরা। সৈন্যের ব্যূহ সংহত সংযত সাজাই বাছাইর দ্বারা সবগুলি মানুষের যে সম্মিলন ঘটে তার থেকে একটা প্রবল শক্তি উদ্ভাবিত হয়—এই শক্তি স্বতন্ত্রভাবে যথেচ্ছ ভাবে প্রত্যেক সৈনিকের মধ্যে নেই—মানুষকে উপাদান করে নিয়ে ছন্দোবিন্যাসের দ্বারা সেনাপতি এই শক্তিরূপের সৃষ্টি করে। এ যেন বহু ইন্ধনের হোম হুতাশন থেকে যাজ্ঞসেনীর আবির্ভাব, ছন্দ সজ্জিত শব্দব্যূহে ভাষায় তেমনি একটি শক্তিরূপের সৃষ্টি।”

কিন্তু ছন্দের এই শক্তি শুধু ভাষার লীলাতেই নয়—সে সার্থক ও সম্পূর্ণ ভাবের বাহনরূপে। ছন্দর ধ্বনি লীলায় যে মন্ত্রশক্তি আছে তার সাহায্যে মানব হৃদয়ের নানা ভাব প্রকৃতির নানা রূপ অসামান্য হয়ে চিরন্তন হয়ে উঠছে, সেই শক্তিরূপকে হৃদয়ে অনুভব ক’রে কণ্ঠে উচ্ছসিত করতে পারার উপর নির্ভর করে আবৃত্তি শিল্প।

রবীন্দ্রনাথের চিত্রকলা

গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের ছবি সম্বন্ধে কিছু লেখবার কথা মাঝে মাঝে ভাবি, যদিও অলক্ষ্যে কখন যে ঐ ছবির ভাষা মনের মধ্যে আবির্ভূত হয়েছে তা আজ স্পষ্ট করে মনে করতে পারি না। এবং হৃদয়ে তীক্ষ্ণ বেদনা বিদ্ধ হতে থাকে যখন স্মরণ করি যে তাঁর জীবিত অবস্থায় এই আবির্ভাব ঘটেনি। এজন্য বিশেষ করে সন্তাপের কারণ এই যে আমাদের চৈতন্যের দৃষ্টির ও অনুভবের এই দৈন্য তাঁকেও পীড়িত করেছিল। সম্ভবত ১৯২৮।২৯ সাল থেকে প্রথমে কালি কলমের ও পরে তুলির লেখায় ঐ বিচিত্র ভঙ্গীময় বাণীমূর্ত্তি প্রকাশিত হতে সুরু হয়। তখন রবীন্দ্রনাথ বার্দ্ধক্যের সীমায় উপনীত। তারপর থেকে দিনের পর দিন কী রকম তীব্র নেশার মত ছবি আঁকার ঝোঁক এল তা আমরা দেখেছিলুম। ঐ পথে প্রকাশের আবেগ যেন কিছুদিনের জন্য কাব্যের উৎসও স্তম্ভিত করে দিয়েছিল। তখন সে ছবি দেখবার উপযুক্ত চোখ এদেশে তৈরী ছিল না। বলা বাহুল্য আমরা যারা তাঁর চারপাশে ছিলুম, আমরাও ঐ অপ্রস্তুত দলের মধ্যেই ছিলুম। দু একজন বিশেষজ্ঞ, দু একজন

গতিশীল স্বভাব আর্টিষ্ট ছাড়া আর সকলেরই ঐ দশা। তবু অনেকেই তাঁকে খুশী করবার জন্য ছলনার আশ্রয় করতেন। কারণ আমরা জানতুম শেষ বয়সে এই কলালক্ষ্মীর অকস্মাৎ আবির্ভাবকে তিনি কি আগ্রহে গ্রহণ করেছিলেন। আত্ম-প্রকাশের এই বিচিত্র নূতন পথ তাঁর চিরপথিক কৌতূহলী চিত্তের কাছে আশ্চর্য্য আনন্দময় বিস্ময় জাগাত। কিন্তু অনভ্যাস ও সাধারণ মানুষের স্বভাবের জড়তা মনের সামনে যে পরদা ফেলে রাখে, তা ভেঙ্গে হয়ত কখনো জ্যোতির্ময় আবির্ভূত হন। কিন্তু কখন কি উপায়ে সেই 'তিমির বিদার উদার অভ্যুদয়' আমাদের মনের সামনে ঘটে তা বিশ্লেষণ করে বোঝা শক্ত। যাই হোক, আমাদের সামনে যে সেই আবরণ ছিল তা তিনি জানতেন, এমন কি যাঁরা ছলনার আশ্রয় করে খুশী করতে চাইতেন বা সত্যিই মনে করতেন যে দেখতে পেয়েছেন তাঁরাও যে অনেকেই তাঁর ছবি দেখতে পাননি একথা তাঁর মর্মস্পর্শী অন্তর্মুখী তীক্ষ্ণ মনের অগোচর ছিল না। যারা নীরবে থাকতুম তাদের স্বভাবের সেই সত্যকে তিনি অশ্রদ্ধা করতেন না, কিন্তু বেদনাতপ্ত হৃদয়ে আজ স্মরণ করছি, মনে মনে পীড়িত হতেন। একথা নিশ্চয়ই অহঙ্কারের মত শোনায়, যেন আমাদের মত অর্বাচীনদের ও প্রাকৃত জনের বোঝা না বোঝায় তাঁর কিছু ক্ষতি হতে পারে। কিন্তু যখন দিনের পরে দিন, একটার পর একটা, অজস্র ছবি আঁকা হত, রংএর ঝরণা বইয়ে দিতেন, সেই প্রবল উৎসাহের বন্যার পাশে আমরা যে শূন্যহাতে দাঁড়িয়ে থাকতুম,

গভীর ইচ্ছা সত্ত্বেও প্রকাশের সেই অনির্বচনীয় স্বরূপ আমাদের হৃদয়ের দরজায় প্রতিহত হত, প্রবেশ করতনা, তখন তিনি ব্যথিত হতেন। বলতেন, "তোমরা ভাব এ আমার একটা ছেলেমানুষী খেয়াল, পাগলামী! কিন্তু পাবে তোমরাও একদিন দেখতে পাবে।" কখনো বা কৌতুক করে বলতেন, "আহা না হয় মিথ্যে ক'রেই দুটো মিষ্টি কথা বললে!" একথা নিশ্চয় সত্য যে পাঠক ও লেখক, শিল্পী ও দর্শক, দাতা ও গ্রহীতার যুগল সম্মিলনের যে গভীর প্রয়োজনীয়তা প্রত্যেক স্রষ্টা অনুভব করেন তা তাঁর মত বিরাট অতিমানবীয় প্রতিভার পক্ষেও অনাবশ্যক ছিল না। দ্বিতীয়ত, যাঁদের হৃদয়ে তাঁর কাব্য স্বমহিমায় পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত তাঁরাও যখন তাঁর এই নূতন সৃষ্টিকে গ্রহণ করতে পারতেন না তখন স্বভাবতই তিনি অনুভব করতেন যে এদেশে এ সৃষ্টির পূর্ণ মূল্য শীঘ্রই পাওয়া যাবে না।

আজ যদিও শিল্প জগতে মানব-মন দ্রুত সঞ্চরণে পরিভ্রমণে নিষ্ক্রান্ত, তবু এখনো এ দেশে রবীন্দ্রনাথের চিত্রকলা সম্বন্ধে সন্দেহ ঘোচেনি। হয়ত যে সব মনের উপর ঐ শিল্পের অলক্ষ্য প্রভাব গভীর ভাবে প'ড়ে আধুনিক চিত্রজগতের মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছে, সে মনেও তার বিশেষত্ব বিশেষ ব্যঞ্জনা পরিস্ফুট নয় বলে সন্দেহ হয়। কারণ যা স্বাভাবিক ভাবেই ঘটতে পারে তা অনুকরণে অসার্থক হয় এবং যা মনের সহজ গতিতে আপনা থেকে আপন পথে প্রবাহিত তা চেষ্টাকৃত হলে তাৎপর্য্যভ্রষ্ট হতে পারে। তবু একথা আজ প্রমাণ হয়েছে যে একদা যে

চিত্র এদেশে বিরাট জিজ্ঞাসার চিহ্ন নিয়ে আবির্ভূত হয়েছিল আজ তা আধুনিক শিল্পী মনের উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করেছে। সেই জন্যই বিশেষ করে রবীন্দ্র চিত্র সম্বন্ধে আলোচনা আধুনিক শিল্পীদের কাছে প্রত্যাশা করি। যদিও কবিতার মত সুরের মত ছবির আবেদন অনুভূতির গোচর, ব্যাখ্যার দ্বারা তার রস লভ্য নয়, তবু একথাও ঠিক যে অভ্যাস চর্চা আলোচনা ও দেখবার ইচ্ছাই দেখবার শক্তি জাগায় এবং অনুভবের দর্পণকে উজ্জ্বল করে তোলে, যাতে বিশ্বের রসময় রূপ উদ্ভাসিত হয়ে উঠতে পারে। তা না হলে অর্থাৎ সাধনার দ্বারা সম্যক উপলব্ধি না হলে সমস্ত রসবস্তুই আমরা পেয়েও পাই না। ক্ষ্যাপার পরশ পাথরের মত সে অলক্ষ্যে স্বর্ণ কবচ পরিয়ে লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। সেই জন্যই রবীন্দ্র-চিত্র-শিল্পের মত লোকোত্তর বিষয় নিয়েও আলোচনা ও বিশ্লেষণের প্রয়োজন অনুভব করি। তাঁর নিজের রচনায় নানা স্থানে তিনি এ সম্বন্ধে লিখেছেন, সেই তাঁর নিজের ব্যাখ্যার সঙ্গে আমাদের চিত্ত ও দৃষ্টি জড়িত হয়ে আজ দেখেছে অদৃষ্টপূর্বকে, একথা পরিষ্কার করে জানাবার দ্বারাই জানবার প্রয়োজন হয়েছে।

রবীন্দ্র কাব্যের একটি বিশেষত্ব যে তা আশ্চর্য্য রকম নূতন হলেও পুরাতনের কেন্দ্র থেকে উৎসারিত। ধীরে ধীরে তাঁর কাব্য অতীত থেকে উদ্ভূত হয়ে ভবিষ্যতের দিকে উদ্ভিন্ন হয়ে উঠেছে। তার যাত্রা যদিও দূরে অজ্ঞাত নূতন পথে তবু সে ধারাবাহিকক্রমে যুক্ত হয়ে আছে পুরাতনের সঙ্গে। ইদানীংকার

কাব্য একেবারে সম্পূর্ণ নূতন ভাষা ভঙ্গী ও রসে মগ্ন—মানসী-র কবি ও পুনশ্চ-র কবি যে এক, চিত্রার ভাষা ও সানাই-এর ভাষা যে একই লেখনী-নিসৃত একথা অনুমান করাই শক্ত হত যদিনা এই পরিবর্তন এই উদ্ঘাটন ধীরে ধীরে ক্রমে ক্রমে ঘটত। মানসী ও খেয়া-য় তত পার্থক্য নেই, পূরবী মহুয়া-র চেয়ে তত দূরে নয় যত পার্থক্য খেয়া ও পত্রপুট-এর ভাষা-ভঙ্গী-ভাবের ব্যঞ্জনায়। এই যে ক্রমবিকাশমান রূপ আমরা কাব্যে দেখতে পাই এই ধারা তাঁর কর্ম জগতে প্রায় সর্বত্রই রয়েছে। কি সমাজ সম্বন্ধে, কি রাষ্ট্রস্বার্থে, কি কাব্যে, কি সুরে, কোথাও বৈপ্লবিক পরিবর্তনের তীব্রতা নেই। ধীরে ধীরে তাঁর কর্ম চিন্তা ভাব ও ভঙ্গী এক পর্য্যায় থেকে অন্য পর্য্যায়ে নীত হয়েছে। যদিও তার দুই প্রান্তের মধ্যে ঘটেছে বিপুল পার্থক্য। কিন্তু ছবি সম্বন্ধে একথা সে রকম করে বলা চলে না। এখানে নূতনের আবির্ভাব অকস্মাৎ। কবির মনের কোন গভীরে এ লুকিয়ে ছিল, অভ্যাস ও চর্চার বাঁধা রাস্তা দিয়ে এতো এল না। সেইজন্য তার পথ পূর্ব থেকে প্রস্তুত ছিল না। এই বিচিত্র আত্মপ্রকাশে সৃষ্টিকর্তা নিজেই বিস্মিত হলেন। কিন্তু কোন সংশয় রইল না তাঁর। মনে মনে অগোচরে পথ হয়েছিল প্রস্তুত। বিশ্বে যে "রং-এর খেলা, রূপের মেলা অসীম সাদায় কালোয়"—প্রত্যক্ষ করেছেন প্রতিদিন, যে আশ্চর্য্য সৌন্দর্য্য প্রতি বস্তু তার অস্তিত্বের মধ্যে নিঃশব্দে বহন করে, কবি-মানসে অলক্ষ্যে সঞ্চিত হয়েছিল তার ছায়া।

"কাণ পেতেছি চোখ মেলেছি
ধরার বুকে প্রাণ ঢেলেছি
জানার মাঝে অজানারে করেছি সন্ধান।"

ভাবের যে সৌন্দর্য্যলীলা ছন্দে, ধ্বনির যে সৌন্দর্য্যবিকাশ সুরে, তেমনি আকার ও ভঙ্গীর মধ্যে বস্তুর যে প্রাণরূপ তাও তাঁর হৃদয়ে রেখাপাত করে এসেছিল—একেবারে হঠাৎ আবির্ভাবের মত তা উদ্ভাসিত হল খাতার পাতায়। লাইনের পর লাইন কাটতে গিয়ে রেখার সঙ্গে রেখার সংযোগে যে রূপ ফুটে উঠতে লাগল—কবি বিস্মিত হয়ে দেখতে পেলেন তার মধ্যে বিপুল অদৃশ্য ভঙ্গীময় জগৎ স্তম্ভিত হয়ে আছে অগোচরে।

ইদানীংকার পদ্যকাব্যেও তার প্রভাব পড়ল। অনেক স্থলেই তাই কবিতা হয়ে উঠতে লাগল ছবি।

"কাক ডাকছে তেঁতুলের ডালে
চিল মিলিয়ে গেল রৌদ্রপাণ্ডুর নীলিমায়
বিলের জলে বাঁধ বেঁধে
ডিঙ্গী নিয়ে মাছ ধরছে জেলে
গাঙচিল উড়ে বেড়াচ্ছে
মাছধরা জালের উপরকার আকাশে······

*　　　*　　　*

চারিদিক থেকে অস্তিত্বের এই ধারা
নানা শাখায় বইছে দিনেরাত্রে। ······

*　　　*　　　*

আজ আমি অলস মনে
আকণ্ঠ ডুব দেব এই ধারার গভীরে।
এর আলোছায়ার উপর দিয়ে
ভাসতে ভাসতে চলে যাক আমার চেতনা
চিন্তাহীন তর্কহীন শাস্ত্রহীন
মৃত্যু মহাসাগর সংগমে।"

সে সময়ে আমাদের দেশে সাধারণত ছবি দেখবার চোখ তৈরী হয়নি। অধিকাংশ লোকই দেখতেন চিত্রিত নরনারী সুন্দর আকৃতির কিনা কিংবা perspective ঠিক আছে কিনা, দেহের সামঞ্জস্য ঠিক আছে কিনা, এনাটমি নির্ভুল কিনা এবং এ সমস্ত ঠিকঠাক হয়ে ছবির অর্থ সুস্পষ্টরূপে প্রকাশিত কিনা। আর্টিষ্ট মনে একটি চিত্র স্থির করে নিয়ে নিয়মমাফিকভাবে রেখা ও রঙ্গের ব্যবহারে সেই তাঁর মানস-চিত্রটির প্রতিরূপ ফুটিয়ে তুলতে চাইতেন। কবি সুরু করলেন একেবারে উল্টো দিক থেকে। কোনো প্রথার পিঞ্জরে আবদ্ধ হওয়া তাঁর চলবেনা। তা ছাড়া ছবি আঁকব বলে ছবি আঁকেননি, সে আপনি এল। তিনি বললেন, "জগতে রূপের আনাগোনা চলেছে—সেই সঙ্গে আমার ছবিও এক একটি রূপ অজানা থেকে বেরিয়ে আসছে জানার দ্বারে, সে প্রতিরূপ নয়।" এই সত্য আমরা কেবল আল্পনায় ও নক্সায় দেখেছিলুম। লাইনের সঙ্গে লাইনের সংযোগে যে বিচিত্র সৌন্দর্য্যরূপ নানা রকম নক্সায় ফুটে ওঠে সে কোনো কিছুর প্রতিরূপ নয়। তার অর্থ তাই নিজের মধ্যেই। তার সার্থকতা

তার আপন অস্তিত্বে। নক্সা বা আলপনা সম্বন্ধে অভ্যাসবশত কোনো সংশয় ওঠে নি, কিন্তু একথা জানি নক্সায় যখন একেবারে প্রতিরূপ গঠন করা হয়েছে তখন তাঁর বিশেষ সৌন্দর্য্য নষ্ট হয়েছে।

মনের মধ্যে ভাঙ্গা গড়া কতই জোড়া তাড়া
কিছু বা তার ঘনিয়ে ওঠে ভাবে
কিছু বা তার ফুটে ওঠে চিত্রে
একদিন এই সব আকাশ বিহারীদের
ধরেছি কথার ফাঁদে
মন তখন বাতাসে ছিল কান পেতে
যে ভাবধ্বনি খোঁজে তারই খোঁজে
আজকাল আছে সে চোখ মেলে
রেখার বিশ্বে খোলা রাস্তায় বেরিয়ে পড়েছে দেখবে বলে
সে তাকায় আর বলে সংসারটা আকারের মহাযাত্রা।"

"রূপই আমার কাছে আশ্চর্য্য, রসই আমার কাছে মনোহর। সকলের চেয়ে আশ্চর্য্য এই যে, আকারের ফোয়ারা নিরাকারের হৃদয় থেকে নিত্য কাল উৎসারিত হয়ে কিছুতেই ফুরাতে চাচ্ছে না।"

এই যে আকার সে সত্য হচ্ছে, মূর্ত্ত হচ্ছে, রূপ নিচ্ছে দ্রষ্টার জ্ঞানে। তত্ত্বে তাই দার্শনিক বলেন, "আমরা যাকে জগৎ বলছি সেটা আমাদের জ্ঞানের যোগে ছাড়া হতেই পারেনা। আমাদের সহজেই মনে হয় বাইরে যা আছে আমরা তাই দেখছি, যেন

আমার মন আয়না মাত্র, কিন্তু আমার মন আয়না নয় তা সৃষ্টির প্রধান উপকরণ। আমি যে মুহূর্ত্তে দেখছি সেই মুহূর্ত্তে যেন দেখার যোগে সৃষ্টি হচ্ছে, যতগুলি মন ততগুলি সৃষ্টি।"

......"আমি এই দেখেছি যে যেদিন আমার হৃদয় মন প্রেমে পূর্ণ হয়ে ওঠে সেদিন সূর্য্যালোকের উজ্জ্বলতা বেড়ে ওঠে চন্দ্রালোকের মাধুর্য ঘনীভূত হয়—তার থেকেই বুঝতে পারি জগৎ আমার মন দিয়ে হৃদয় দিয়ে ওতোপ্রোত।"........সেই জন্যই চিত্রকরের চিত্রে, কবির কাব্যে, বিশ্বরহস্য নূতন নূতন রূপ নিয়েছে। ভিতর ও বাহিরের এই মিলনে কবির শক্তিশালী বেগবান মনে যে রূপ উদ্ভিন্ন হয়ে উঠেছে বাইরে তার ঠিক প্রতিরূপটি নেই। যেমন বেহাগ সুরটি যদি বিনে কথায় বাজিয়ে যাও তখন সেই ধ্বনির লীলায় যে মাধুর্য্য উৎসারিত জগতে তার প্রতিরূপটি কোথাও নেই। তাই তার অর্থও নেই।

প্রত্যেক রূপের মধ্যেই সকল অর্থের অতীত একটি অরূপ ব্যঞ্জনা আছে আমাদের নিত্য ব্যবহারের অভ্যাস তাকে আড়াল করে। প্রত্যেক বস্তুর একটি বিশেষ বাণী আকারে ভঙ্গীতে ব্যক্ত, আমরা তাদের দেখি চিনি, ব্যবহারের জিনিষ বলে মনে করি, ভাল মন্দ বিচার করি, কিন্তু তবুও তাদের অনেক খানি দেখতে পাইনে। আর্টিস্ট যখন ছবি আঁকেন তখন সেই বস্তুর কেবল মাত্র অস্তিত্বের মধ্যেই যে অনির্ব্বনীয় রূপটি আছে তাকে প্রকাশ করেন। সে সুন্দর কি কুৎসিত, ভালো কি মন্দ, সঙ্গত কি অসঙ্গত তার দ্বারা শিল্পের পূর্ণ মূল্য নয়। পূর্ণ মূল্য সে বহন করেছে আপন

অস্তিত্বে। যদি আমাদের মনে তা ধরা পড়ে তবেই আমরা বস্তুর ভিতরে ছবিকে দেখতে পাই। ক্ষণকালীন ভঙ্গুর রূপ চিরকালীনে প্রবেশ করে। কবি বলতেন, "আমাদের দেশে লোক ছবি দেখতে জানে না। তারা দেখে চেহারাটা সুন্দর হয়েছে কিনা, দেখতে হয় সেটা ছবি হয়েছে কিনা।"

এই দেখা কি করে দেখব ? বিচারে বিশ্লেষণে এর কোনো নিয়ম তৈরী হবে কি ? সেই নিয়ম মিলিয়ে দেখবো ? তা সম্ভব নয়। তবু এও ঠিক যে সহসাই তা দেখতে পাইনে। দেখতে দেখতে ক্রমে সেই অন্তর্নিহিত রূপ উদ্ভাসিত হয়। যেমন তত্ত্ব যখন তর্ক করে পাই তখন তা নীরস কাঠামো, কিন্তু চিন্তা করতে করতে সেই ভাবে ভাবিত হতে হতে যখন তা উপলব্ধির ভিতরে প্রবেশ করে তখনই লাভ করি তার সত্যকে। তেমনি সুরের, বাক্যের, ভঙ্গীর ও আকারের রূপে যে অনির্বচনীয় রস তা সত্য হয় যখন সেই বিশেষ ভঙ্গীটির তাৎপর্য আমাদের বিস্মিত মনের আনন্দে মিলিত হয়। কেন তা জানিনে। আর জানার মধ্যেই তার অর্থ সমাপ্ত নয়। সুর যেমন কথাকে ছাড়িয়ে আছে এ ছবিও তেমনি বস্তুকে অবলম্বন করেও বস্তুকে ছাড়িয়ে আছে। কবি বলেছিলেন, "সংক্ষেপে বলতে গেলে আমার কাব্যে একটি মাত্র পালা, সে সীমার সঙ্গে অসীমের মিলন সাধনের পালা।" একথা তাঁর ছবি সম্বন্ধেও সত্য। প্রত্যেক বস্তু যে পদার্থ দিয়ে তৈরী, তার যে প্রয়োজন অপ্রয়োজন, তার যে ব্যবহারিক অর্থ, এর কোনোটার মধ্যেই তার সমগ্র স্বরূপ নিরন্ধ্র হয়ে নেই। তার

ভঙ্গিমার মধ্যে, তার জড়দেহের রেখায় রেখায়, তার আপন অস্তিত্বের মধ্যেই একটি আশ্চর্য্য সংবাদ সে বহন করে রেখেছে। যে আর্টিস্ট তাকে দেখতে পেয়েছে সেই দেখেছে বস্তুর ভিতরে ছবিকে, তুচ্ছর মধ্যে অনির্বচনীয়কে। তাই কবি বলেছেন, "It may not be the representation of a beautiful woman but that of a common place donkey or of something that has no external credential of truth in nature but only in its own inner artistic significance."

রবীন্দ্রনাথের ছবির অনেক বিশেষত্বের মধ্যে সর্বপ্রধান তার রং। যে বিচিত্র স্রোতে রং-এর ঝরণা বইয়ে দিয়েছেন সে পূর্বের কোনো নিয়ম মানলে না। কোনো বিশেষ পদ্ধতির দ্বারা চালিত হল না। তার স্বাভাবিক গতি নিয়মের শিকল দিয়ে আবদ্ধ হল না। যে ছবি চলতে চলতে অরণ্যে পর্বতে দেখেছেন তারই বিস্মৃত স্মৃতি ধরা পড়ল রং-এর উচ্ছ্বাসে, যে রং সঞ্চিত হয়েছে 'আধো ঘুমে আধো জাগায়।' তাঁর রঙ্গীন প্রাকৃতিক দৃশ্যের ছবি তাই এক অপূর্ব রহস্যলোকের ইসারা আনে যে রহস্য এই জলে স্থলে অন্তরীক্ষে অরণ্যে পর্বতে ব্যাপ্ত।

দ্বিতীয় বিশেষত্ব, জীবজন্তু ও মানুষের মুখের নানা বিচিত্র ভঙ্গী। জন্তুর জড় দেহের অন্তরালে যে নানা অস্ফুট ভাব প্রকাশের জন্য আর্ত, "সেই মূঢ় মূক" আত্মার বেদনা রেখায়

রেখায় ব্যক্ত। মানুষ ও প্রকৃতির মাঝখানে আছে জন্তু, তার পশু দেহে জড় ও চৈতন্যের প্রথম সঙ্গমে যে অস্ফুট আর্ত্তি তা কতগুলি জন্তুর চিত্রে বিশেষ ভাবে প্রকাশিত।

যদিও সংকল্প স্থির করে তিনি ছবি আঁকেননি তবু লাইনের সঙ্গে লাইন যোজনায় রং-এর পরে রং ফলানতে যে সংকল্প গ'ড়ে উঠেছে, জগতে তার প্রতিরূপ থাক বা না থাক, মানব হৃদয়ে তার একটি বিশেষ আবেদন এসে পৌঁচেছে। রেখা ও রং-এর যে অদৃশ্য জগৎ বস্তুর পরিচয় ও নামরূপের বন্ধনে আটকে পড়ে ঢাকা পড়ে যায়, তা যেন আবরণ মোচন করে প্রবেশ করেছে অন্তরের সেই রহস্যলোকে, যেখানে রূপকথার জগৎ মায়াময় ছায়ালোক বিস্তার করে সত্য হয়ে ওঠে।

জন্মদিনে

প্রত্যেকবার জন্মোৎসবে এসে মনে হয় বাংলা দেশের হৃদয়ের মধ্যে আপনা থেকে এই উৎসবের দিনটি নির্দিষ্ট হয়ে গেল। স্মৃতি-সৌধ আমরা তুলতে পারিনি। নানা কারণে পঁচিশে বৈশাখ ছুটির দিন বলেও নির্দ্ধারিত হল না। কিন্তু তবু অনেক দুঃখ কষ্ট বাধা বিপত্তির মধ্যেও এই যে উৎসবের আনন্দ গুঞ্জরিত, লক্ষ লক্ষ টাকা তুলে স্মৃতি রক্ষার ব্যবস্থার চেয়ে এর মূল্য বেশী।

সভাস্থলে বেশী কথা বলবার যোগ্যতা আমার নেই—এবং উৎসবের আনন্দে যোগ দিতে বক্তৃতারও প্রয়োজন হয় না—তবু 'জন্মদিনে' রচিত কবিতাগুলির সম্বন্ধে দু একটি কথা বলে ও দু'একটি কবিতা পড়ে আমার শ্রদ্ধা নিবেদন করব।

জন্মদিনের প্রথম কবিতা আমরা পাই পূরবীতে—পূরবী, যা কবির সান্ধ্যজীবনের ছবি—অস্তরবির রশ্মি এসে পড়েছে যার উপর—যার প্রথম কবিতাটিই সুরু হয়েছে শেষের কথায়,

...গান গেয়ে নে থাকতে দিনের আলো,—
বলে নে ভাই "এই যা দেখা এই যা ছোঁওয়া এই ভালো এই ভালো।

* * *

এই ভালোরে ফুলের সঙ্গে আলোয় জাগা, গান গাওয়া এই
ভাষায়,
তারার সাথে নিশীথ রাতে ঘুমিয়ে পড়া নূতন প্রাতের আশায়।

এই নূতন প্রাতের আশার আলোকে পূরবীর ছন্দে আমরা পেলুম প্রথম জন্মদিনের উদ্বোধন। জন্মোৎসবের বাঁশি বাজল প্রথম যখন জীবন মৃত্যু ঘনিষ্ঠ হয়ে এসেছে। প্রকৃতির প্রতি যে ভালবাসা কবিকে একান্ত করে জীবনের আনন্দরসে পূর্ণ করে রেখেছিল, জীবনের পাত্র পরিপূর্ণ হয়ে মরণেও তা পরিব্যাপ্ত হ'য়ে যেতে চাইল।

বলাকায় যখন লিখেছিলেন—"এমন একান্ত করে চাওয়া এও সত্য যত, এমন একান্ত ছেড়ে যাওয়া সেও সেই মত"—তখন অনুভব করেছিলেন সেই একান্ত বিচ্ছেদের নির্মমতা সত্ত্বেও "এ দুয়ের মাঝে তবু কোনোখানে আছে কোনো মিল নহিলে নিখিল, এত বড় নিদারুণ প্রবঞ্চনা, হাসিমুখে এতকাল কিছুতে বহিতে পারিতনা।" সেই মিলের সন্ধান এবং তা লাভের উপলব্ধির আনন্দে উদ্ভাসিত জন্মদিনের ক্রমবিকাশমান কবিতা-গুলি। অদূর ভবিষ্যতে জীবন যে তার নির্দিষ্ট গণ্ডীকে অতিক্রম করে যাবে—সেই নূতন অস্তিত্বের স্বরূপকে জানবার জন্য নানা মত, যুক্তি ও ধ্যানের বিষয়ীভূত হয়ে দেশে দেশে কালে কালে দার্শনিককে দিয়েছে তত্ত্ব, সাধককে দিয়েছে সত্য। এবং তত্ত্ব ও সত্যের মিলনে জেগেছে এই দার্শনিক ও সাধক কবি-মানসে উপলব্ধির আনন্দ। যুক্তি দিয়ে চিন্তা দিয়ে জীবনকে

তিনি দেখেছেন তার গণ্ডী অতিক্রম করে জীবনাতীতের মধ্যে প্রবেশ করবার পথে—আর অনুভবে তিনি লাভ করেছেন সেই গতিচাঞ্চল্যের আনন্দ।

জীবনের যে অনিবার্য পরিণতি, সে যদি হঠাৎ বিচ্ছিন্নভাবে আসে, পূর্বের সমস্ত যোগকে খণ্ডন করে, অর্থহীন অনর্থের মত, তবে মৃত্যুকে তো লাভ করা হয়ই না, জীবনের দানও হয় ব্যর্থ। যদিও এ জীবনে পাওয়াটারই সীমাহীন মূল্য

মরণে হারানটাতো নহে তার তুল্য—

কিন্তু মরণে যে হারান নয়, সেই সত্যই নানারূপে প্রকাশিত জন্মদিনের ক্রমবিকাশমান কবিতাগুলির মধ্যে।

প্রথম কবিতা "পঁচিশে বৈশাখ"এ অনুভূতির গাঢ়তায় জীবনের গণ্ডী গেল লুপ্ত হয়ে। সে আপন সত্বাকে পরিব্যাপ্ত দেখলে অসীমের মধ্যে। কালের সীমা সে উত্তীর্ণ হয়ে গেল, করলে কালের নিরবিচ্ছিন্ন ধারাকে অনুভব।

ঝরণা যেমন প্রতিপলেই নবজন্ম লাভ করে, সিন্ধু যেমন প্রতি তরঙ্গে নূতন, তেমনি বিশ্বের প্রাণ সত্তার প্রতি মুহূর্তেই ঘটায় নূতনের অভ্যুদয়। তাই সেই সচল মহাকালের প্রবাহে আবর্তিত জীবনের প্রত্যহ নূতন জন্মদিন।

"ব্যক্ত হোক জীবনের জয়—
ব্যক্ত হোক তোমা-মাঝে অসীমের অক্লান্ত বিস্ময়।"

মৃত্যুর দ্বার পথে যে নব জীবনের অভ্যুদয়, শীতের পরে যে বসন্ত—নূতন করে পাওয়ার জন্যই যে হারানোর লীলা, যা

ফাল্গুনী প্রভৃতি কাব্যে কবি বারবার বলেছেন, জন্মদিনের কবিতার মধ্যে আমরা তার চেয়েও একটি নূতন দিকের সন্ধান পাই। মৃত্যুকে উত্তীর্ণ হ'য়ে ব্যক্ত হোক জীবনের জয়, আরো ব্যক্ত হোক 'তোমা মাঝে অসীমের অক্লান্ত বিস্ময়'। অসীম যে আপনাকে ক্ষণে ক্ষণে সীমার মধ্যে প্রকাশ করছে স্বেচ্ছায়, কারণ বিশেষের মধ্যে বিচিত্র আত্মপ্রকাশে নির্বিশেষের লীলার আনন্দ—এই সত্যকে আমরা তত্ত্বরূপে পাই 'আমার ধর্ম' প্রভৃতি প্রবন্ধে, যেখানে তিনি বিশেষ করে বুঝিয়েছেন মানুষের মধ্যে এই দুই সত্ত্বার অস্তিত্ব। এক সত্ত্বা—যে দেশ কালাতীত হয়ে পরিব্যাপ্ত অসীমে, আর এক সত্ত্বা—যে ব্যক্তি বিশেষ,—তুমি, আমি—যার অনিবার্য পরিণতি ভস্মে—। তবু মানুষের অন্তরে কার্য্যে, চিন্তায় অন্য বৃহত্তর সত্ত্বার, নির্বিশেষের বা অসীমের চিহ্ন এবং প্রকাশ আছে—সে কথা শুধু কাব্য কল্পনায় নয়, যুক্তি নির্দিষ্ট প্রমাণে বহু গদ্য প্রবন্ধে তিনি বর্ণনা করেছেন। সেই সত্যই জন্মদিনের কবিতাগুলির মধ্যে আনন্দঘন উপলব্ধির গাঢ়তায় পরিস্ফুটিত। এই কবিতাগুলির মধ্যে তাই জীবন মৃত্যুর সীমারেখা এসেছে লুপ্ত হয়ে সেই ঐক্যবোধের আনন্দে। বৃহত্তর জীবনের পরিব্যাপ্তি এসেছে তাঁর অনুভবে। তিনি তাঁর বিশেষ রূপকে পার হয়ে বিশ্বসত্ত্বায় যুক্ত হতে চাইছেন সেই চেষ্টায় তাঁর চেতনায় যে আনন্দলীলা তাতে জন্মমরণের গণ্ডী মুছে গেছে।

'পঁচিশে বৈশাখ' নামে পূরবীর এই কবিতাটির পর থেকে আমরা প্রায় বৎসরে বৎসরে জন্মদিনের কবিতা পাই কিন্তু সর্বদাই

তারা যেন এসেছে মৃত্যুর পটভূমিতে—তবু বিচ্ছেদের আশঙ্কা নিয়ে, বিলুপ্তির আতঙ্ক নিয়ে নয়, প্রেমের প্রতিজ্ঞা নিয়ে—সেই প্রেম যা মৃত্যুকে অতিক্রম করে যাবে—

এই শেষ কথা নিয়ে, জীবন আমার যাবে থামি—
কত ভাল বেসেছিনু আমি।
অনন্ত রহস্য তার উচ্ছলি আপন চারিধার
জীবন মৃত্যুরে দিল করি একাকার।

জীবনের প্রতি সেই ভালোবাসাই উত্তীর্ণ করে নিয়ে চলেছে জীবনের গণ্ডী, তাই আজ জীবনের অর্থ "মৃত্যুর সীমা ছাড়ায়ে গিয়াছে দূরে"। জীবনের যে বিচিত্র রূপ, সৌন্দর্য্য-উপলব্ধিতে, স্নেহে-প্রেমে, গানে-ছন্দে বিকশিত, তারই ভিতরে কবি দেখেছেন জীবনকে প্রতি মুহূর্ত্তে তার সীমা উত্তীর্ণ হতে— দেখেছেন "অসীমের স্বাক্ষর সেখানে"।—তাই সারা জীবন ধরে তাঁর কাব্য ও জীবনের এই গতি, সীমা থেকে অসীমে, বচন থেকে অনির্বচনীয়ে।

জন্মদিন ও মৃত্যুদিন যে একটী আর একটীর বিরুদ্ধ নয়, বিপরীত নয়, একটী থেকে আর একটীতে গতি একটা বিশেষ পরিণতি—যেমন ফুলের পরিণতি ফলে, ফুলের সমস্ত অস্তিত্বকে লুপ্ত ক'রে কিন্তু মিথ্যা ক'রে নয়—তেমনি জীবন মৃত্যুর আকর্ষণে ব্যর্থ হয়ে যায় না, মিথ্যা হয় না, আপনাকে খণ্ডন করেনা, জন্মদিন মৃত্যুদিনে উত্তীর্ণ হয়ে নূতন অস্তিত্বে আপনাকে লাভ করে।

আজ আসিয়াছ কাছে জন্মদিন মৃত্যুদিন
একসনে দোঁহে বসিয়াছে
দুই আলো মিলেছে জীবন প্রান্তে মম,
রজনীর চন্দ্র আর প্রত্যূষের শুকতারা সম।”—

সেই আলোতে দেখলেন বিশ্বব্যাপী চেতন ও অচেতনে রহস্যময় যোগ। অনুভব করলেন লোক থেকে লোকান্তরে, যুগ থেকে যুগান্তরে পরিব্যাপ্ত প্রাণের গতি উৎসব! যেজন্য অনায়াসে বললেন—

ওই শুনি আমি চলেছি আকাশে
বাঁধন ছেঁড়ার রবে নিখিল আত্মহারা
ওই দেখি আমি অন্তবিহীন সত্ত্বার উৎসবে
ছুটেছে প্রাণের ধারা—
সে ধারার বেগ লেগেছে আমার মনে
এ ধরণী হতে বিদায় নেবার ক্ষণে।
নিবায়ে ফেলিব ঘরের কোণের বাতি
যাব অলক্ষ্যে সূর্য্যতারার সাথী।

‘আমি’ রূপে যে অস্তিত্ব আবদ্ধ ছিল তার বন্ধন যখন আল্‌গা হ’য়ে এল তখন অন্তসীমায় আবির্ভূত সেই অনন্ত তীর অতিক্রম-কারী সিন্ধুর মত আপনাকে অতিক্রম করতে চাইল। এ লীলায় বিচ্ছেদের ভয় বিলুপ্তির শঙ্কা বড় হয়ে উঠতে পারে না, কারণ সে পার হবে স্বল্প থেকে ভূমায়। “যা ছিল ঘরের কোণের বাতি” তাকে নিবিয়ে ফেলতে শঙ্কা কি, যখন “যাব অলক্ষ্যে সূর্য্যতারার সাথী?”

"এ ধরণী হতে বিদায় নেবার ক্ষণে"—ক্রমে যে ভাবটি একটি ক্রমপরিণত অনুভূতির প্রকাশে জন্মদিনের কবিতাগুলির মধ্যে রূপ নিয়েছে, সেই ভাব ইদানীংকার অধিকাংশ কবিতার মধ্যেই প্লাবিত দেখতে পাওয়া যায়—সে বিদায় বেদনাশীর্ণ নয়, সে অনুভব করছে ঘরের বাতি জ্বালাবার এবং নিবায়ে ফেলবারও সার্থকতা। যখন বাতি জ্বলেছিল তখন "মর্তের বুকে অমৃত পাত্রকে সে দেখেছে। এখন সে যাত্রা করবে সূর্য্যতারার সাথী হয়ে।

সেই যে অলক্ষ্যপথে অজানা পরিণামে প্রবেশ করতে হবে, সেই দূরকে কবি নিজের অন্তরে অনুভব করলেন। মানুষ চলেছে, সমস্ত বিশ্ব প্রকৃতির মতনইধূ—লিকণা থেকে সূর্য্যতারকা পর্য্যন্ত একসঙ্গে, দূরান্তরে অজানা পথে। সেই দূরত্ব সেই অজানার রহস্য মানুষের আপন স্বরূপের মধ্যেও রয়েছে। সে নিজেকেও জানে না, জানেনা তার আদি অন্ত, জানেনা "সে কী রহস্য সূত্রে বাঁধা" বিশ্ব প্রকৃতির সঙ্গে, চেতন অচেতনের সঙ্গে। তার যাত্রা ঐ নক্ষত্রের মত, সূর্য্য-চন্দ্র-তারার মত, রহস্যে আবৃত—"আজি এই জন্মদিনে দূরের পথিক সেই তাহারি শুনিনু পদক্ষেপ নির্জন সমুদ্রতীর হতে"।

তমোঘন অন্তহীন সেই আকাশের বক্ষস্তলে
অকস্মাৎ করেছি উত্থান—
অসীম সৃষ্টির যজ্ঞে মুহূর্ত্তের স্ফুলিঙ্গের মতো
ধারাবাহী শতাব্দীর ইতিহাসে।

কিন্তু এই অসীম সৃষ্টির যজ্ঞে উদ্ভূত বিশেষ মানবচৈতন্যও ক্ষণিক ও ভঙ্গুর হলেও অকিঞ্চিৎকর বা ব্যর্থ নয়। সে

মহারহস্যসূত্রে গ্রথিত সমস্ত বিশ্বের সঙ্গে, ধূলিকণা থেকে গ্রহ নক্ষত্রের সঙ্গে। সেই যোগের রহস্যাবৃত অনুভবে কবির চিরদিনের আনন্দ উৎস।

বিশ্বসাথে যোগে যেথায় বিহারো
সেইখানে যোগ তোমার সাথে আমারো।

এই কথাগুলি কেবল একটি মত হিসাবে, তত্ত্ব হিসাবে, মৃত্যুর পর কোনো অস্তিত্ব থাকে কিনা সেই দুশ্চিন্তার খাতিরে লেখা নয়। সেই যোগকে শিরায় শিরায়, কবিত্বে, মননে, আনন্দে, বিষাদে, জীবনে অনুভব করে জীবনের সার্থকতার আনন্দ জন্মদিনের কবিতাগুলির মধ্যে গভীর ভাবে পাওয়া যায়—

সাবিত্রী পৃথিবী এই আত্মার এই মর্ত্য নিকেতন
আপনার চতুর্দিকে আকাশে আলোকে সমীরণে
ভূমিতলে সমুদ্রে পর্বতে
কী গূঢ় সংকল্প বহি করিতেছি সূর্য্যপ্রদক্ষিণ
সে রহস্য সূত্রে গাঁথা এসেছিনু আশীবর্ষ আগে
চলে যাব কয় বর্ষ পরে।

সেই সংকল্প রহস্যাবৃত হয়ে আছে কিন্তু তাকে দেখবার জন্য কবির চিত্ত আগ্রহ ব্যাকুল।

করো করো অপাবৃত হে সূর্য্য আলোক আবরণ
তোমার অন্তরতম পরম জ্যোতির মধ্যে দেখি
আপনার আত্মার স্বরূপ।"

সন্ধ্যাবেলার অস্তসূর্য্য যেমন আসন্ন "রাত্রির মুখশ্রীকে স্বর্ণময়ী

করে দেয়, তেমনি জীবনের পশ্চিম সীমায় পৌঁছে অস্তরবির গভীর ধ্যানের আলোক পড়েছে জীবনের উপর "আলোকে তাহার দেখা দিল, অখণ্ড জীবন যাহে জন্মমৃত্যু এক হয়ে আছে"।

যে আমিত্ব শেষ হয়ে যাবে,"বায়ুতে মিলায়ে প্রাণবায়ু", "ভস্মে যার দেহ অন্ত হবে", সেই 'আমি' যেন বড় হয়ে উঠে তার আপন যাত্রাপথে ছায়া না ফেলে, সেই দেহসীমা বদ্ধ জীবনের সুখ দুঃখ আশা নিরাশা লোভ ক্ষোভের বন্ধন যেন একমাত্র হয়ে অতিকায় হয়ে উঠে আড়াল না করে সত্যকে—যে সত্য প্রকাশিত হবে বলে অপেক্ষা করে আছে দেহের সীমার অন্তরালে। যদিও জীবনে বৈরাগ্য নেই কবির, জীবনের ধন ফেলবার নয়—কারণ মর্ত্যের লীলাক্ষেত্রে সুখে দুঃখে অমৃতের স্বাদ পেয়েছেন।

"বারে বারে অসীমেরে দেখেছি সীমার অন্তরালে
—বুঝিয়াছি এ জন্মের শেষ অর্থ ছিল সেইখানে।"

তাই খেলাঘরের দরজা খুলে গেলে—"ধরণীর দেবালয়ে রেখে যাব আমার প্রণাম।"—তবু যাব; কারণ ফল যেমন পেকে এলে তার বৃন্ত শ্লথ হয়ে আসে তেমনি পুরাতন আমার আপন আজ নিজেকে নূতন অস্তিত্বে সম্প্রসারিত করতে চায়—

"সুদূরে সম্মুখে সিন্ধু নিঃশব্দ রজনী
তারি তীর হতে আমি আপনার শুনি পদধ্বনি।"

সেই দূরান্তর যাত্রী পথিকের পদধ্বনি শোনা যায় জন্মদিনের প্রত্যেক কবিতায়।

পঁচিশে বৈশাখ জোড়াসাঁকোয় পঠিত।

রবীন্দ্র সাহিত্য পাঠ

আমাদের শিশুকাল থেকে আজ পর্য্যন্ত এই সময়ের মধ্যে শিক্ষিত অৰ্দ্ধশিক্ষিত এবং প্রাচীন ও অর্বাচীন নানা লোকের মুখে নানা প্রসঙ্গে রবীন্দ্র সাহিত্য সম্বন্ধে যত মতামত ও রায় শুনেছি এক এক সময় মনে হয় তার একটি লিপিবদ্ধ সংগ্রহ রাখলে মনস্তত্ত্বের একটি বিরাট অধ্যায় রচনা করা চলত, যার দ্বারা বোঝা যেত সাহিত্য বিচারের কি রকম মাপ কাঠি পাঠক সাধারণের মনে রয়েছে।

অনেক যথেষ্ট শিক্ষিত লোকের মুখেও নানা বিস্ময়কর মন্তব্য আজও শোনা যায়। এই সম্প্রতিও একজন বিশিষ্ট বিদ্বান, শিক্ষক, সাহিত্যিক খ্যাতিমান ব্যক্তি বললেন, 'রবীন্দ্রকাব্যে, খালি জ্যোৎস্না আর দক্ষিণা বাতাস।'

যখন কোনো সভায় কোনো বিশেষ কবি বা ঔপন্যাসিক সম্বন্ধে আলোচনা হয়, যেমন মাইকেল মধুসূদন, সত্যেন দত্ত, শরৎচন্দ্র এমনকি আধুনিক কোনো সাহিত্যিকের, তখনই অবলীলাক্রমে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে অনেক তুলনা হয় এবং কোথাও কোথাও বক্তা উৎসাহের বশে সেই সেই সাহিত্যিকের ও কবির বিশেষ

প্রতিভা রবীন্দ্রনাথকে উত্তীর্ণ হয়েছে একথা বলেন। যেমন বলতে শুনেছি মাইকেলের কাব্যে যে বীররস আছে রবীন্দ্র সাহিত্যে তা নেই। সত্যেন্দ্র দত্তে যে ছন্দের পরীক্ষা আছে তা রবীন্দ্র সাহিত্যে নেই, শরৎচন্দ্রে যে মধ্যবিত্ত সংসারের ছবি আছে, পতিতের সমবেদনা আছে তাও নেই, আধুনিক কবির কাব্যে যে "বাস্তবতা" আছে তা নেই, এমন কি অমুকের উপন্যাসে যে সব গ্রাম্য জমিদারের চরিত্র চিত্র আছে তাও নেই। একথাগুলি আমি কল্পনা করে বলছিনা। নানা জায়গায় বিদ্বজ্জন-মুখে ও পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধযোগে এসব মতামত আমাদের অনেকেরই শ্রুতিগোচর হয়েছে! তথাপি এই সব ত্রুটি বিচ্যুতি সত্ত্বেও রবীন্দ্র সাহিত্য যে নীরব নিস্তরঙ্গ গভীর সমুদ্রের মত এদেশের মানব মনের তলদেশে প্রবাহিত—তার অনির্বচনীয় অনুভব অনেকেরই মনে আছে, তাই জেনে হোক বা না জেনে হোক, ইচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায় হোক, প্রভাবান্বিত হয়েই হোক বা প্রভাব মুক্ত হবার 'হাঁকুপাঁকু'তেই হোক তা নানা উপায়ে আপনাকে প্রকাশ করে, কিন্তু জ্ঞানের উপর যে-অনুভবের ভিত্তি নয়, তাতো টলমল করবেই।

আমাদের এই দুর্ভাগা দেশে বোধ হয় সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ রবীন্দ্র সাহিত্য কিন্তু সে সম্বন্ধে আমাদের অপার ঔদাসিন্য। আমরা যেমন তেমন করে সে সম্বন্ধে উল্লেখ করি, যে সে যা খুসী অভিমত প্রকাশ করতে সাহসী হই। কারণ বহু সাহিত্যিক জন্মান সত্ত্বেও সাহিত্যের পূর্ণ মর্য্যাদা এদেশে আজও প্রতিষ্ঠিত নয়।

আজ বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে পৌঁছে যাঁরা রবীন্দ্র সাহিত্য মনোযোগ সহকারে পড়েছেন ও হৃদয়ে অনুভব করেছেন, তাঁরা জানেন মানব চিত্তের এমন সার্বভৌম প্রকাশ জগতে আর কোথাও ঘটেনি। কোনো একটি বিশেষ কথা, মত বা চরিত্র, কোনো এক বিশেষ জাতীয় ছন্দ বা অলঙ্কার রবীন্দ্রসাহিত্যে আছে কি নেই তা নিয়ে অন্য যে কোনো কবি বা লেখকের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের তুলনা করা হাস্যকর। একথা বোধ হয় আর কোনো লেখকের সম্বন্ধে খাটে না কারণ রবীন্দ্রনাথ একজন লেখক মাত্র নন। মানব চিত্তের চরমতম কল্পনা-শক্তি ও প্রজ্ঞা একত্র হ'য়ে যে গভীর চিন্তার অন্তমু'খী স্রোতকে আনন্দে, লাস্যে ঊর্মিমুখর করে সমুদ্রতরঙ্গবাহিত পৃথিবীর মত প্রাণদায়িনী হয়ে উঠেছে সে সম্বন্ধে সজ্ঞান উপলব্ধি করতে হলে, রবীন্দ্রনাথের কাব্য ও দর্শন যে অভিনিবেশ সহকারে পড়া প্রয়োজন, দুঃখের সঙ্গে বলতে হয়, আজও আমাদের সে বিষয়ে কোনো ব্যবস্থা ও উৎসাহ নেই।

রবীন্দ্রনাথের জীবিতকালে তাঁর সমসাময়িকেরা তাঁকে জানবার বিশেষ প্রয়োজন বোধ করেন নি। সময়ের নৈকট্য-বশত ঈর্ষ্যাদ্বন্দ্ববিক্ষুব্ধ চিত্তে কেউবা অশ্লীল, কেউবা ভাবালু, কেউবা দুর্বোধ্য ইত্যাদি বলে নিজের মনকে সান্ত্বনা দিয়েছেন, বোঝবার চেষ্টামাত্র করেননি। পরবর্তীকালে ক্রমে তিনি যে একজন জগৎবরেণ্য মহাকবি একথা অগত্যা স্বীকার্য্য হয়েছে এবং তাঁর মৃত্যুর পর থেকে নিন্দাবাদ বন্ধ হয়ে এসেছে, ২৫শে বৈশাখ

স্বাভাবিক ভাবে একটি জাতীয় উৎসবের দিন হয়ে দাঁড়িয়েছে (যদিও ছুটি না দিয়ে এবং সম্মান প্রকাশের কোনো ব্যবস্থা না করে এদেশের গভর্ণমেণ্ট আজও অবহেলা প্রকাশ করতে লজ্জিত নন), তবু রবীন্দ্রনাথকে বোঝবার জানবার, তাঁর আশ্চর্য্য মনন শক্তির ভিতর দিয়ে বিশ্বসত্যকে অনুভব করবার চেষ্টা, আজও ভারতবর্ষে সুরুই হয়নি বলা চলে।

আজকাল কলকাতায় অসংখ্য সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান হয়েছে শুনতে পাই—তাদের তরফ থেকে কখনো কখনো ছেলেমেয়ে জুটিয়ে মাইক লাগিয়ে রবীন্দ্র সঙ্গীতের জলসা হয়। সুর সম্বন্ধে আমি অভিজ্ঞ নই, কাজেই মতামত প্রকাশ করবার ধৃষ্টতা রাখিনা—সুর হয়ত ঠিকই হয় কিন্তু অনেক সময়ই পাঠে ভুল থাকে কারণ অর্থের উপলব্ধির সম্ভাবনামাত্র নেই। যে আশ্চর্য ভাবলীলায় রবীন্দ্র সঙ্গীত তরঙ্গায়িত তার পূর্ণ অনুধাবন সাধনা সাপেক্ষ। ছোটখাট নানা নামধারী নানা প্রতিষ্ঠান হয়েছে বটে কিন্তু রবীন্দ্র সাহিত্য পড়বার কোনো উপযুক্ত প্রতিষ্ঠান বা ব্যবস্থা নেই। স্কুল কলেজের পাঠ্যপুস্তকে রবীন্দ্রনাথের কবিতা প্রায়ই একটি দুটির বেশী থাকে না। অন্যান্য বহু কবি সাধারণের সঙ্গে এ বিষয়ে পক্ষপাত দোষ নেই বললেই হয়। অন্য কোনো জীবিত বা মৃত কবির প্রতি অসম্মান প্রদর্শন আমার উদ্দেশ্য নয়। সকলের কবিতাই ভালো সে সম্বন্ধে আমার সন্দেহ নেই এবং আমি সমস্ত বাংলা কবির লেখাই পড়ে থাকি। তবু একথা তো বলতেই হবে শিক্ষার্থী জ্ঞানার্থীদের অঞ্জলি রবীন্দ্র

সাহিত্যরসে পূর্ণ করবার প্রয়োজনীয়তা কতখানি। সেই আশ্চর্য্য রহস্যঘন সৌন্দর্য্যের মধ্যে প্রবেশ করতে হলে অবসর সময়ে সঞ্চয়িতার পাতা ওল্টান যথেষ্ট নয়। যেমন একটি বিদ্যা আয়ত্ত করতে দীর্ঘ দিনের সাধনা ও অভ্যাস প্রয়োজন তেমনি এই দার্শনিক ও সাধক কবির যে বিরাট চিন্তাজাল কখনো যুক্তিতে, কখনো আনন্দ-আবেগের বিচিত্র প্রকাশে দেশকে নানা শক্তিতে উদ্বুদ্ধ করতে, জাগ্রত করতে প্রচেষ্ট, তাকে সচেতন অনুধাবন দিয়ে সার্থক করবার চেষ্টা আমাদের কই ?

একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে রবীন্দ্রনাথের কোনো কবিতা বা কোনো রচনাই বিক্ষিপ্ত বিচ্ছিন্ন নয়। যদিও ভাষা ও ভাবের বৈচিত্র্যবশত একখানি বই-এর সঙ্গে আর একখানির পার্থক্য অনেক। 'গীতাঞ্জলি' ও 'মহুয়া' যে একই কবির লেখা তা হয়ত আপাত দৃষ্টিতে বোঝাই শক্ত। তবু একথা সত্য যে রবীন্দ্র-ভাবধারার কতকগুলি মূল পথ আছে, কতকগুলি বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী আছে। বিশ্ব ও মানব সত্যের যে রূপ তাঁর চিন্তায় প্রকাশমান তা প্রবল যুক্তির দ্বারা প্রমাণিত হয়ে গদ্যে এবং উপলব্ধির আনন্দ-মথিত হয়ে পদ্যে প্রকাশিত।

সেইজন্য গদ্যের সঙ্গে পদ্যকে মিলিয়ে দেখতে পারলে অতি সহজে পরিষ্কার ভাবে রবীন্দ্র সাহিত্যের মধ্যে প্রবেশ করতে পারা যায়। যাঁরা কবিতা পড়তে অভ্যস্ত নন, কবিতার ছাঁচের মধ্যে প্রবেশ করবার মত মনকে যাঁরা নমনীয় করতে পারেননি, তাঁদের পক্ষে ও সকলের পক্ষেই গদ্য-পদ্যের যুগল সম্মিলনে যে

পূর্ণতার অনুভব সম্ভব তা দু একটি গান শুনলে বা দু'একটি কবিতা পড়লে হবার নয়। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত এদেশে এ সম্বন্ধে কোনো চেষ্টা নেই—বেতারে এবং ইউনিভার্সিটিতে সর্বত্রই দেখি অনেক পুঞ্জীভূত ভারের মধ্যে একত্রিত হয়ে কখনো কখনো একটু আধটু রবীন্দ্র সাহিত্যের ঝলক দেখা যায়।

বাংলা সাহিত্য একটি সমৃদ্ধিশালী সাহিত্য—অনেক লেখক আছেন—তাঁদের সকলেরই দাবী আছে, স্থান আছে। কিন্তু সে সব সত্ত্বেও এই রবিকরোজ্জ্বল ভাষার উত্তরাধিকারী যাঁরা তাঁরা আত্মচিন্তা উত্তীর্ণ হয়ে ভবিষ্যৎ বংশের তৃষিত অঞ্জলিতে সেই অমৃত ঢেলে দেবার দায়িত্ব গ্রহণ না করলে বঞ্চনা করা হবে দেশকে।

সমন্বয়-সাধনা

আজ পূজনীয়া প্রতিমা দেবীর অনুরোধে শ্রীনিকেতনের উৎসবে কিছু বলতে অগ্রসর হয়েছি।

এই তীর্থক্ষেত্রে বাস করবার পুণ্যভাগী যাঁরা হয়েছেন তাঁদের কাছে আমরা প্রার্থী হয়েই আসি, দিতে আসার স্পর্দ্ধা আমাদের নেই।

স্থানে কালেই গড়ে ওঠে বিচিত্র মানব-সমাজ, বিভিন্ন শিক্ষা সংস্কৃতি নিয়ে তাই স্থান-মাহাত্ম্য কাল-মাহাত্ম্য দু-ই তার শরীরে মনে তার সর্বাঙ্গীন অনুভূতিতে প্রবেশ না করে পারে না। সেজন্য যেমন সুগন্ধি ফুলের সংস্পর্শে এলে সুরভিত হয়ে ওঠে গন্ধহীন বস্তু, তেমনি এই প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের সঙ্গে মানবিক সৌন্দর্য্য-সম্পদের মিলনতীর্থে যাঁরা বাস করেন তাঁদের মধ্যে এর প্রভাব প্রত্যহ অলক্ষ্যে পড়ছে। আশ্রমের পথ সুরু হতেই কুঁড়ে ঘরের আলিম্পন ও পর্দার নক্সা থেকে সেই প্রভাবের প্রকাশ আগন্তুকের মনকে বিস্মিত করে। গুরুদেবের তপস্যায় এই শান্তিনিকেতন এমন আশ্চর্য্য সৌন্দর্য্য নিকেতন হয়ে

বিকশিত হয়ে উঠেছে। মানুষকে তার সব রকম দিক থেকে পূর্ণ করে তোলবার দিকেই ছিল সেই পরম শিক্ষকের লক্ষ্য। মানুষ যা হতে চায় পারে না, তার যে অস্ফুট আকাঙ্খা নানা স্বষ্টিতে মূর্তি নিতে চায়—মনুষ্যত্বের আদর্শের সেই পূর্ণ বিকশিত রূপ আমরা দেখেছি এই মহাজীবনে।

এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার এখানে সময় হবে না—শুধু বিশেষভাবে শান্তিনিকেতন, শ্রীনিকেতন ও তারি সঙ্গে জড়িত ভাবে তাঁর বিভিন্ন কর্মোদ্যমের মধ্যে এবং সমগ্র জীবনের মধ্যে যে সমন্বয় সাধনা আমাদের ক্ষুদ্র দৃষ্টিতে লক্ষ্য হয়েছে সে সম্বন্ধে সামান্য কিছু আলোচনা করব।

যেটা তাঁর উপলব্ধির জীবন সেই বিরাট মানসলোকের মহাকাশ প্রতিবিম্বিত হয়েছে তাঁর কর্মজীবনে কোনও সামঞ্জস্য ভগ্ন না করেই। তাই রবীন্দ্র-সাহিত্য, রবীন্দ্র-জীবন এবং তাঁর হাতে তৈরী এই বিশ্বভারতী এই তিনের মধ্যে রয়েছে অপূর্ব সঙ্গতি। বলতে পারা যায় এ আর আশ্চর্য্য কথা কি? তিনটিই যে একই ব্যক্তিত্বের প্রকাশ, সামঞ্জস্য থাকবে না কেন? কিন্তু তা হলেও এ দুর্লভ। আমরা যদি অন্যান্য কবিদের ও নানা বিরাট প্রতিভার জীবন আলোচনা করি তাহলেই দেখতে পাই এ সামঞ্জস্য প্রায়ই ঘটে না। বড় বড় ব্যক্তিত্বের চিন্তা, মতামত এবং কাব্য ও সাহিত্যের সঙ্গে তাদের কর্ম ও জীবন মেলে না। তাই পদে পদে পদস্খলন। Harmony বা সামঞ্জস্যই সব সৌন্দর্য্য স্বষ্টির মূল কথা, সেই সামঞ্জস্য শুধু যে ছবিখানি আঁকিছি

বা যে কবিতাটি লিখছি তারই রঙ্গে, ছন্দে নয়, তা রূপকারের সমস্ত জীবনে, কর্মে, ব্যক্তিত্বে যখন ঘটে তখনি আমরা এই দেব-দুর্লভ সৌন্দর্য্য দেখতে পাই। একটি উদাহরণ দিয়েই এই কথাটি বলব—অবশ্য এর মধ্যে ভুল থাকতে পারে। গুরুদেব যে সময়ে আবির্ভূত হয়েছিলেন সে সময় বিদেশী প্রভাব প্রবল প্রতাপান্বিত। আমাদের অশনে, বসনে, ভূষণে, সাহিত্যে সর্বত্র তারই রাজত্ব—আমরা নিজেদের ভাষাটি ভুলতে আপ্রাণ চেষ্টা করছি, আচারে ব্যবহারে শিক্ষানবিশী করছি। সাহিত্য থেকে স্থুরু করে বেশভূষা সমস্তই ধার করা সম্পদে ভরে তুলতে চাইছি। বিলিতি সভ্যতার নতুনত্বে আমাদের মন তখন রঙীন। তখন গুরুদেব বল্লেন, "এ চলবে না—ইয়ুরোপীয় সমাজ তার বহুদিনের সাধনায় যে সভ্যতা বৃক্ষটিকে ফলবান করিয়া তুলিয়াছে তার দু'একটি ফল আমরা চাহিয়া চিন্তিয়া লইতে পারি কিন্তু সমস্ত বৃক্ষটিকে আপনার করিতে পারিব না"। আমাদের বিরাট সমৃদ্ধ অতীত, আমাদের বিপুল ইতিহাস, আমাদের চির পুরাতন ভারতবর্ষ তাঁর ধ্যানে প্রবেশ করল, তিনি বললেন, "সমস্ত কিছুরই ইতিহাস আছে, বিচ্ছিন্নভাবে হঠাৎ কোনো কিছুই ঘটতে পারেনা। গোলাপ ফুল সে গোলাপ গাছেরই ইতিহাসের সামগ্রী, অশ্বত্থ গাছের নহে।" একথা একদিক থেকে আশ্চর্য্য সন্দেহ নেই কারণ কবি যে চির নূতনের পূজারী যা কিছু নূতন তাই তাঁর মনকে আকর্ষণ করে—পুরাতনকে আঁকড়ে থাকা তো তার ধর্ম নয়। বস্তুত পুরাতনের সমস্ত বন্ধনকারাগার

ভাঙতেই তিনি চান জীবনকে ছুটিয়ে দিতে নব নব পথে নব নব সন্ধানে। তিনি যে চলেছেন সম্মুখে—

“আমরা চলি সমুখ পানে কে আমাদের বাঁধবে
রইল যারা পিছুর টানে কাঁদবে ওরা কাঁদবে—
রুদ্র মোদের হাঁক দিয়েছে বাজিয়ে আপন তূর্য্য
মাথার পরে ডাক দিয়েছে মধ্য দিনের সূর্য্য
মন ছড়াল আকাশ ব্যেপে
আলোর নেশায় গেছি ক্ষেপে
ওরা আছে দুয়ার ঝেঁপে চক্ষু ওদের ধাঁধবে
কাঁদবে ওরা কাঁদবে।”

পিছনের সহস্র বন্ধনকে এড়িয়ে সাগরগিরি লঙ্ঘন করে এই যে নূতনের সন্ধানে যাত্রা সেই নূতন কিন্তু আসছে পুরাতনের সূত্র ধরেই। সে হঠাৎ ঝড়ে উড়িয়ে নিয়ে আসা নয়—সে পুরাতনের কেন্দ্র থেকেই উৎসারিত নব জীবনের অভিমুখে। রবীন্দ্র কাব্যে নূতনত্ব সেই রকম, যেমন চিরপুরাতন সূর্য্যোদয় প্রত্যহ নূতন। যেমন প্রতি বসন্তে অশোক, পলাশ নূতন করে ফোটে। সেই পুরাতন মৃত্তিকার রস পান করে। যেমন প্রতি বর্ষায় কুলপ্লাবিনী নদী নূতন তরঙ্গে তরঙ্গিত। সেইজন্য ভারতবর্ষের চিরকালীন সাধনা, তার উপনিষদের বাণী, বুদ্ধের মৈত্রী সমস্তই রবীন্দ্র-সাহিত্যে প্রবেশ করেছে। নূতনত্বের লোভে গাছকে তিনি মাটি থেকে উৎপাটিত করেন নি। বৃক্ষের জন্মজন্মান্তরের সাধনা ফলরূপে আমাদের হাতে আসে, তারই বীজ মাটিতে

পড়ে নূতন গাছে নূতন ফুল ফোটে, তেমনি সমস্ত ভারতবর্ষের যুগ যুগান্তের সাধনা বীজরূপে প্রবেশ করেছিল রবীন্দ্রজীবনে, আর সমস্ত রবীন্দ্র-সাহিত্য ও বিশ্বভারতীর নানা কর্মপ্রয়াসে তা বিকশিত পুষ্পপল্লবে।

সাহিত্যের বেলাও দেখি চির নূতনের প্রয়াসী ভাষায় বা ভঙ্গীতে কোথাও চমক লাগাতে উদ্যত হননি। একবার তাই আধুনিক বাঙলা সাহিত্যে নূতনত্বের আমদানী দেখে বলেছিলেন—সম্প্রতি বাঙলা সাহিত্যে দেখি 'খুন্' কথাটা প্রচলিত হয়েছে। পুরাতন রক্তে যখন যথেষ্ট রক্তিমা প্রকাশ পায় না তখন রচনার সে দুর্বলতা গায়ের জোর দিয়ে ঢাকবার চেষ্টা হয়। কি ভাষায়, কি ভঙ্গীতে, কি চিন্তায় সর্বত্র জ্যোতির্ময় নূতন প্রকাশিত হয়েছে তেমনি করেই, যেমন করে চির পুরাতন আকাশের পটে ঘটে নবীন সূর্যোদয়। অনেক সময়েই দেখা যায়, শুধু আমাদের দেশে নয়, সর্বত্রই যখন মন পুরাতনের বন্ধনে অসাড় হয়ে জীর্ণ হয়ে যায় তখন স্বল্প-শক্তি, স্বল্প-প্রতিভারা নূতনকে পাবার চেষ্টায় নানা রকম কসরৎ করতে থাকেন। সাহিত্য শিল্প সে প্রচেষ্টায় এক একটি ছোটখাট মল্লভূমি হয়ে ওঠে, অদ্ভুত অদ্ভুত চিন্তা, অদ্ভুত অদ্ভুত ভাষা ঠেলাঠেলি করতে থাকে। যেমন, তখন তারা বলেন ফুলের সুগন্ধ দক্ষিণা বাতাসও একেবারে পুরাণো হয়ে গেছে, ও আর নৈব নৈব চ। এখন হাঁপর ইঞ্জিন শ্রমিক ধনিক কামার কারখানা বয়লার, পলাশ আর অশোকের চেয়ে অনেক বেশী নূতন এবং বাস্তব। তৎসত্ত্বেও

দক্ষিণা বাতাস, সুরভিত কুসুম প্রত্যেক বসন্তেই নূতন হ'য়ে মানুষের হৃদয়ের দরজায় আসে—

টুটল কত বিজয়-তোরণ লুটল প্রাসাদ চূড়ো
কত রাজার কত গারদ ধূলোয় হলো গুঁড়ো—
আলীপুরের জেলখানাও মিলিয়ে যাবে যবে—
তখনো এই বিশ্ব-দুলাল ফুলের সবুর সবে—
রঙীন কুর্তি সঙীন মূর্তি রইবে না কিছুই
তখনো এই বনের কোনে ফুটবে লাজুক জুঁই।

সেই জন্যই আজকাল যাকে বলে বিপ্লব, সেই ধরণের বিপ্লবী বৃত্তি আমরা এই আশ্চর্য্য শক্তি অভূতপূর্ব প্রতিভার মধ্যে কোথাও দেখতে পাইনা। আমাদের বাল্যকালে বিপ্লব কথাটা আমরা নিন্দাসূচক অর্থেই জানতুম—একটা বিপ্লব বাধিয়ে দেওয়া এমন কিছু ভাল কথা ছিল না। কিন্তু ইদানীং কথাটির মর্য্যাদা আশ্চর্য্য রকমে পরিবর্তিত হয়েছে। অনেকেই শুনতে পাই বিপ্লবী এবং অনেকেই চান বিপ্লব ঘটাতে। এর অর্থ হয়ত এই যে সমস্ত সৃষ্টির মূলেই কিছু ভাঙন আছে। কিন্তু আজকাল গড়ার কথাটা সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়ে ভাঙনের উন্মত্ত মূর্তির তাণ্ডব সুরু হয়ে গেছে নিঃস্ব মানুষের হৃদয়ের উপর। এই যে বিরাট রবীন্দ্র প্রতিভা নানা আশ্চর্য্য নূতন সৃষ্টিতে সার্থক হল, এর মধ্যে কোথাও আমরা নির্বিচার বিপ্লবের সূচনা দেখতে পাই না। অনেক কুসংস্কার অনেক মূঢ় মত তিনি

ভেঙ্গেছেন তামসিকতার জড়ত্বের আবরণ ছিন্ন করে, তার ভিতর থেকে উদ্‌ঘাটিত করেছেন সেই সত্যকে যা নিত্যকালের পুরাতন, যা 'প্রভাতের আলোর সমবয়সী'। যা ভেঙ্গেছেন তা গড়বার প্রয়োজনে ও তারই সঙ্গে যোগে, তাই কোথাও তা অদ্ভুত ও প্রচণ্ড হ'য়ে ওঠেনি। সামঞ্জস্য ভঙ্গ করেনি।

রবীন্দ্রনাথের বিপ্লব তাই বসন্তের পূর্বে শীতের মতন যে কথা তিনি 'ফাল্গুনী' নাটকে বিশেষ করে বুঝিয়েছেন।

যেমন তাঁর কাব্যে তেমনি তাঁর কর্মে এবং জাতীয়জীবনে এই সামঞ্জস্যের প্রকাশ। তাঁর মতে বিরোধ মাত্রই একটা শক্তির ব্যয়, অনাবশ্যক বিরোধ অপব্যয়। "দেশের হিতব্রতে যাঁরা কর্মযোগী অত্যাবশ্যক কণ্টকক্ষত তাঁদের পদে পদে সহ্য করিতেই হইবে কিন্তু শক্তির ঔদ্ধত্য প্রকাশ করিবার জন্য স্বদেশের যাত্রাপথে নিজের চেষ্টায় কাঁটার চাষ করা হিতৈষিতা নহে।" সেইজন্যই সমস্ত সাময়িক উত্তেজনাকে উপেক্ষা করে যখন বিলিতি বর্জন ও কাপড়-পোড়ানর উত্তেজনায় দেশ বিক্ষুব্ধ তখন নানা বিরোধিতা ও নিন্দা সহ্য করেও তিনি একাকী সেই ক্ষেত্র প্রস্তুত করতে প্রবৃত্ত হলেন যেখানে দাঁড়িয়ে দেশের বিস্তীর্ণ মঙ্গল ঘটান সম্ভব। তখন সেই বিপ্লবের বিষয় তিনি বলেছিলেন— "গড়িয়া তুলিবার একটা স্বাভাবিক প্রবৃত্তি যাহাদের মধ্যে সজীব ভাবে বর্তমান, ভাঙনের আঘাত তাহাদের সেই জীবনধর্মকেই সৃজনীশক্তিকেই সচেষ্ট সচেতন করিয়া তোলে। এইভাবে সৃষ্টিকেই নূতন বলে উত্তেজিত করে বলিয়াই প্রলয়ের গৌরব, নতুবা

শুদ্ধমাত্র ভাঙন নির্বিকার বিপ্লব কখনো কল্যাণকর হইতে পারেনা।”

কাজেই আঘাতের উত্তেজনার যে কোনও মূল্যই নেই একথাও তিনি বলেন নি। তারও প্রয়োজন ছিল, মনকে ঔদাসিন্য থেকে, অসাড়তা থেকে জাগিয়ে তোলবার জন্য। তাই উত্তেজিত কণ্ঠেই তিনি গাইলেন “শাসনে যতই ঘেরো, আছে বল দুর্বলেরো।” কিন্তু লোকে যা অনেক সময়ে বলে থাকে যে তিনি ভাবুক বুর্জোয়া কবি স্বপ্নবিলাসী ইত্যাদি তারা একথা অনুধাবন করেনা যে গান গেয়েই তিনি ক্ষান্ত হলেন না। সন্ধান করতে বেরুলেন কোথায় সে দুর্বলের বল সঞ্চিত আছে। “আছে বল দুর্বলেরো” এ বিশ্বাস শুধু আশাবাদীর সঙ্গীত নয়। এ একটা সত্য উদঘাটিত হল। দুর্বলের বল কোথায়? হঠাৎ একটা বোমা ফেলায় নয়, আচমকা ছুটো পিস্তলের গুলীতেও নয়—অসহযোগের দ্বারাও নয়, বিলিতি কাপড় পুড়িয়ে রেশমী চুড়ী ভেঙ্গেই সে বল সঞ্চিত হয়ে উঠে না। কারণ এ সমস্তই ‘না’এর দিকের ধ্বংসের দিকের কথা, সৃষ্টির দিকের নয়। সমস্তই ক্রোধের কথা, তপস্যার কথা নয়—তখন তিনি তপস্যার দ্বারা সেই বল সঞ্চয়ে, শক্তি সঞ্চয়ে প্রবৃত্ত হলেন যার দ্বারা দেশের সর্বাঙ্গীন মঙ্গল ঘটান সম্ভব। এ কাজ হঠাৎ তাড়াতাড়ি ঘটিয়ে দেবার নয়—এ একটা সৈন্যসমাবেশ নয়, ভিতর থেকে মানুষ তৈরী করবার কাজ। দীর্ঘ বিলম্বিত এর পথ। কর্মের সেই প্রকাণ্ড ক্ষেত্র কেমন করে সূচনা করতে

হবে সে সম্বন্ধে তার বিস্তীর্ণ পরিকল্পনা নানা স্থানে বিস্তারিত করে বলেছেন। “দেশের সমস্ত গ্রামকে নিজের সর্বপ্রকার প্রয়োজন সাধনক্ষম করিয়া তুলিতে হইবে। কতগুলি পল্লী লইয়া এক একটি মণ্ডলী স্থাপিত হইবে। সেই মণ্ডলীর প্রধানগণ যদি গ্রামের সমস্ত কর্মের এবং অভাব মোচনের ব্যবস্থা করিয়া মণ্ডলীকে নিজের মধ্যে পর্য্যাপ্ত করিয়া তুলিতে পারে তবেই স্বায়ত্ত শাসনের চর্চা দেশের সর্বত্র সত্য হইয়া উঠিবে।” সেই অভাব মোচন হবে কি করে? না সমবেত চেষ্টায়। আজ থেকে প্রায় চল্লিশ বছর পূর্বে গুরুদেব এই সমবায় প্রথার কল্পনা করেন। “অদ্যকার দিনে যাহার যতটুকু ক্ষমতা আছে সমস্ত একত্র মিলাইয়া বাঁধ বাঁধিবার সময় আসিয়াছে। এ না হইলে ঢালু পথ দিয়া আমাদের ছোট ছোট সামর্থ্য ও সম্বলের ধারা বহিয়া গিয়া অন্যের জলাশয় পূর্ণ করিবে।······পল্লীবাসীরাই একত্রে মিলিলে ও স্বস্থানেই কর্মের উন্নতি করিতে পারিলে সকল দিক রক্ষা হইতে পারে। এমনি করিয়া ভারতবর্ষের প্রদেশগুলি আত্মনির্ভরশীল ও ব্যূহবদ্ধ হইয়া উঠিলে ভারতবর্ষের দেশগুলির মধ্যে তাহার কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠা সার্থক হইবে।”

এই যে স্বরাজ্যের পরিকল্পনা এ শুধু কল্পনায় রইল না এর কাজ শুরু হয়ে গেল। যে বিরাট কর্ম প্রচেষ্টা শান্তিনিকেতন ও শ্রীনিকেতনে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত হয়ে গড়ে উঠছে—এর উদ্দেশ্য মানুষ তৈরী করা—‘তার মাঠকে উর্বর, জলাশয়কে নির্মল, বায়ুকে নিরাময়, বিদ্যাকে বিস্তৃত ও চিত্তকে নির্ভীক’ করা। বলা বাহুল্য

পৃথিবীতে সমস্ত মানব মঙ্গল প্রচেষ্টারই এই একই উদ্দেশ্য। কিন্তু সেই উদ্দেশ্য পদে পদে উপায়ের দ্বারা কলঙ্কিত হয়ে গিয়ে জগতে কি ঈর্ষ্যা দ্বন্দ্ব বিদ্বেষের সৃষ্টি করেছে। সৃষ্টি করেছে অসংখ্য মতবাদের উন্মত্ত কলহ।

কিন্তু গুরুদেব কোনও "ইজম"-এর কাঠামো তৈরী করে মানুষকে তার ছাঁচে ফেলতে চাননি। কল্যাণকে লাভ করতে, মঙ্গল সাধন করতে হলে যে আগে চাই সর্বগ্রাসী বিপ্লব—এর কোনো প্রয়োজনীয়তাই তিনি অনুভব করেন নি। সেই যে চির পুরাতন গ্রাম ও তার মণ্ডলী তারই সাহায্যে তিনি গড়ে তুলতে চাইলেন স্বরাজ্য। অর্থাৎ যে রাজ্য আমাদের একান্তই নিজস্ব। ভারতবর্ষের আদর্শ-চিন্তা ও কর্মের সঙ্গে যার কোনো বিরোধ নেই!

রবীন্দ্রনাথের বিরাট সৃষ্টি ক্ষেত্রে কোথাও তাণ্ডবের প্রয়োজন হয়নি। গড়ার জন্য যে ভাঙ্গা তা তিনি করেছেন বটে তবে সমস্তই পূর্বাপরের সঙ্গে সমন্বয়ে। যে সৃষ্টি তিনি গড়তে চেয়েছেন তা সমস্তই অতীতে অঙ্কুরিত হয়ে ভবিষ্যতের দিকে উদ্ভিন্ন হয়ে উঠেছে। এই সত্য আমরা শ্রীনিকেতনে তৈরী মাটির পাত্রের গায়ে সামান্য একটা ফুলের নক্সাতেও পাই। সেইজন্যই শান্তিনিকেতন ও শ্রীনিকেতন এমন আশ্চর্য্য সৌন্দর্য্যে পূর্ণ হয়ে উঠতে পেরেছে। কারণ সামঞ্জস্যই সৌন্দর্য এবং সৌন্দর্যোপলব্ধিতেই মানুষের পরম পূর্ণতা।

এই সমন্বয় সাধনা নানা দিক থেকে নানাভাবে ঘটেছে। সে বিষয়ে বহু আলোচনা চলে কিন্তু এখানে তার সময় হবে না

শুধু একটি কথা বলে আজ শেষ করব যে এই সামঞ্জস্য বিধান কেবল অতীতের সঙ্গে বর্তমান ও ভবিষ্যতের নয়, পুরাণো সংস্কার ও সমাজের সঙ্গে নূতন সমাজের নয়, এক কথায় অতীত ভারতের সঙ্গে বর্তমান ভারতেরই শুধু নয়—মানুষের চরিত্র ও জীবনের মধ্যেও তা ঘটাতে চেয়েছেন। মানুষের জীবনের যে নানা দিক আছে তার যে নানা উপলব্ধি আছে—তার মধ্যেও সমন্বয় করতে চাইলেন। মানুষ ত্যাগ করতে চায়, দেশের সেবা করতে চায় একথা সত্য, তেমনি নিজেও সে ভোগ করতে চায়—আনন্দিত হতে চায়, সুখী হতে চায়, শিল্পে, সৌন্দর্য্যে, রসে সম্ভোগে বিকশিত হতে চায়—একথাও ঠিক। ত্যাগ ভালো বলে সেইটাই সর্বব্যাপী হয়ে তাকে একটি কৌপীনধারী সন্ন্যাসী করে তুললে তার মনুষ্যত্বের পূর্ণতা নষ্ট হয়, এ সম্বন্ধে কবির দৃষ্টি ছিল পূর্ণ সজাগ। গ্রামে ফিরতে হবে, কুঁড়ে ঘরে থাকতে হবে, তাঁত বুনতে হবে, সহজ অনাড়ম্বর জীবন চাই, কারণ—

নব বৎসরে করিলাম পণ লব স্বদেশের দীক্ষা
তব আশ্রমে তোমার চরণে হে ভারত লব শিক্ষা
পরের ভূষণ পরের বসন
তেয়াগিব আজ পরের অশন
যদি হই দীন না হইব হীন
ছাড়িব পরের ভিক্ষা।

কিন্তু তাই বলে প্রত্যেকে নিজ হাতে বোনা একটি ছোট্ট খদ্দর পরে কাটাব এ দাবী তিনি উপস্থিত করেন নি। জীবনকে

তার বিচিত্র সম্ভারে পূর্ণ করে তুলতে হবে। শীর্ণ করে ফেলা কবির পক্ষে অসম্ভব। দেশের অবস্থার সঙ্গে মানিয়ে কুটীর শিল্পকে নূতনভাবে উজ্জীবিত করতে চেয়েছেন সৌন্দর্য্যশ্রী মণ্ডিত করে। তাঁতে বস্ত্র বুনে নেব কিন্তু একখানা মোটা চট নয়—কারণ প্রয়োজনের দাবীই মানুষের কাছে চরম সত্য নয়। মানুষের প্রত্যেক সাধনা প্রত্যেক মহৎ প্রয়াস যেমন প্রয়োজনাতীতের মধ্যে সার্থক হয়ে ওঠে—তেমনি করেই তাঁর এ প্রচেষ্টাও সার্থক হয়ে উঠবে। তাই মোটা একখানি খদ্দর নয়, বুনতে হবে বিচিত্র কারুকার্য্যময় শিল্প বস্ত্র। মাটির ঘরে থাকতে হলেও তাই শান্তিনিকেতন এমন কুঁড়ে ঘর বানায় অট্টালিকার চাইতেও যা মনোরম।

মনে আছে আমরা যখন চট্টগ্রামে ছিলাম তখন আমাদের দিয়ে তিনি সেখানকার কত রকম করে খড়ের ছাউনী ও বাঁশের বেড়া বোনা হয় তার একটি সংগ্রহ করিয়েছিলেন। বিজ্ঞ লোকেরা হাসতেন—রবীন্দ্রনাথ বাঁশের বেড়া দিয়ে কী করবেন? এই তাঁর বিশেষত্ব। মানুষের মনুষ্যত্বের প্রকাশ যে তার দৈহিক জৈবিক সীমাকে অতিক্রম করছে ছোট বড় নানা শিল্পে, নানা কলায়, এবং তবেই পূর্ণতা পাচ্ছে। তাই তিনি সমন্বয় ঘটালেন প্রয়োজনের সঙ্গে সৌন্দর্য্যের বা সীমার সঙ্গে অসীমের। কেবলমাত্র নেতিবাদের দ্বারা চিত্তকে শুকিয়ে ফেলে যে কর্মোদ্যম সে তাঁর কাছে অসম্পূর্ণ, কারণ—"যা কিছু আনন্দ আছে রূপে গন্ধে গানে, আমার আনন্দ রবে তার মাঝখানে।"

কালিংপং-এ জন্মদিন

আজ আমাকে আপনারা ব্যক্তিগত সম্পর্কে পূজনীয় রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে কিছু বলতে বলেছেন। আমরা যাঁরা শিশুকাল থেকে তাঁর চরণের ছায়ায় বেড়ে ওঠবার সুযোগ ও সৌভাগ্য পেয়েছিলাম তাদের পক্ষে এ কাজ কঠিন হবার কথা নয়। কিন্তু মুস্কিল এই যে সমস্ত ব্যক্তিগত স্নেহ বন্ধনেরই একটি 'প্রাইভেসী' আছে—তা সভাক্ষেত্রে চেঁচিয়ে বলবার নয়। এই জন্যই কবি নিজে ডায়েরী লেখার পক্ষপাতী ছিলেন না। তা সত্ত্বেও আমি সে কাজ কিছু কিছু করেছি কিন্তু ততটুকুই করেছি যতটুকুতে হৃদয় তার তটঃসীমা ছাড়িয়ে বাইরে এসে পড়ে না। কবিতায় যত খুশী লেখা চলে বাঁধন ছেঁড়া ভাবনা কিন্তু গদ্যে মনকে লাগাম পরিয়ে চালাতেই হবে।

কবিতায় মনের অনুভূতি ফুলের মতন ফুটে ওঠে কিন্তু গদ্যে তার অনাবশ্যক ডাল পাতা ছেঁটে ফেলে সাজান চাই। তার নীচে ফুলদানী তাতে জল চাই। অর্থাৎ তার আদি অন্ত সমস্তই একটা নির্দিষ্টতার মধ্যে বেঁধে ফেলতে হবে। কিন্তু কবিতায় সে অসীম অগোচর থেকে এক মুহূর্তে বিকশিত হ'য়ে উঠতে পারে গানের সুরের মত।

কিন্তু মানুষের মনের ভাবনায় তার আনন্দ বেদনায় নানা বিচিত্র অনুভূতির মধ্যে একটি অনির্দিষ্টতা আছে, সেই অভিজ্ঞতা তাই গদ্যে লিখতে গেলে তার সঙ্গে আগে পিছে খানিকটা জুড়ে দিয়ে তবেই তাকে দাঁড় করান যায়—স্নেহ প্রীতি ভক্তি প্রেম প্রভৃতি মনের ভাবনাগুলি যে অনির্বচনীয় বেদনায় মনে বাজতে থাকে কবিতায় তারা অসীম সৌন্দর্য্যে বিকশিত হয়ে উঠতে পারে দু'একটি লাইনে। কিন্তু গদ্যে তাকে অনেক বেশী direct করতে হবে।

সেইজন্য ঠিক সে যেমনটি ছিল, মনের মধ্যে অস্ফুট আলোকে সে যেমন করে স্পন্দিত হয়েছিল, ঠিক তেমনিটি প্রকাশ করা যায় না। বিশেষত সেই যে অপরূপ লাবণ্য যা তাঁর প্রতিদিনের ব্যবহারে, আলাপে, ক্ষরিত হত তার আনন্দময় প্রভা ধারণ করে রাখবার উপযুক্ত আধার কমই আছে! যে তিনি একদিকে প্রতিভায় শক্তিতে জ্ঞানে কর্মে দীপ্যমান, অন্যদিকে হাস্যে, কৌতুকে, গানে, গল্পে, আনন্দে ঝলমল করতেন, যাঁর প্রতিটি ক্ষুদ্র কথার মধ্যেও একটি আশ্চর্য্য সুষমা উজ্জ্বল হয়ে উঠত, আজ আর তাকে প্রত্যক্ষ করে তোলা কঠিন।

সেজন্য দৈনন্দিন জীবনের গল্প একদিক থেকে যেমন সোজা অন্যদিকে তেমনি কঠিন। এ সম্বন্ধে তাঁরই দুটি লাইন মনে পড়ে—

সহজ কথা বলতে আমায় কহ যে
সহজ কথা যায়না কহা সহজে।

বিশেষত: ব্যক্তিগত কথা বলবার একটি পরিবেশ চাই— সভা তার উপযুক্ত স্থান নয়। সেজন্য তাঁর শেষ জীবনের কয়েকমাস এই কালিংপং ও মংপু পাহাড়ে হিমালয়ের আতিথ্যে যে সমস্ত অপরূপ কাব্য রচিত হয়েছিল তারই দু একটি সম্বন্ধে আলোচনা করে আজকের বক্তব্য শেষ করব।

প্রথম যেবার তিনি কালিংপং আসেন সে ১৯৩৮ সালের গ্রীষ্মকাল। সেবার ২৫শে বৈশাখ জন্মোৎসব কালিংপং-এ সম্পন্ন হয়েছিল। আজকের দিনে এখানে বসেই তিনি একটি কবিতা পাঠ করেছিলেন। টেলিফোন যোগে তা কলকাতায় relay করবার বন্দোবস্ত হয়েছিল।

এই জন্মদিন কবিতাটি রবীন্দ্র সাহিত্যের একটি উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক বলে মনে করা যেতে পারে। ঐ সময়ের অনতিপূর্বে কবি দারুণ ইরিসিপ্লাস রোগাক্রান্ত হয়েছিলেন। সেই মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে জীবনলীলার প্রতি কবি যে গভীর দৃষ্টিপাত করেছেন এই কবিতায় সেই দর্শন উদ্ভাসিত। তাই স্বরুতেই তিনি বলেছেন আজকের এই জন্মদিন "ডুব দিয়ে উঠেছে বিলুপ্তির অন্ধকার হতে মরণের ছাড়পত্র নিয়ে"। মৃত্যুর মোহানায় দাঁড়িয়ে কবি অনুভব করছেন জীবনের পথিকবৃত্তি। চলমান জীবন এসে দাঁড়িয়েছে মৃত্যুর প্রান্তে, এখান থেকে জন্ম মৃত্যুর দুই আলো দিয়ে তিনি দেখছেন "প্রাণের জন্মভূমি" ও তার লীলা। আসক্তি-বন্ধনবিহীন হয়েছে মন মৃত্যুর পরিণতিকে জীবনে গ্রহণ করে। বহুদিন পূর্বে তিনি যে গান গেয়েছিলেন,

'মরণকে তুই পর করেছিস ভাই, জীবন যে তোর তুচ্ছ হল তাই'। সেই সুরটিই সত্য হয়ে উঠেছে এই কবিতাটিতে। এইখানে দাঁড়িয়ে শুধু চিন্তায় মননে নয়, উপলব্ধিতে তিনি দেখলেন, জীবনের যে বন্ধন সংসারের সুখে, দুঃখে, লোভে, ক্ষোভে জড়িত তার গ্রন্থি ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে। সংসারের কর্তব্য শেষ হয়েছে, "কর্মীর সাজের" আর প্রয়োজন নেই। যে দেহ দৈহিক নানা প্রয়োজনের কর্মে নিযুক্ত ছিল, আজ তার জৈব ধর্ম সমাপ্তির মুখে—"তাই ক্রমে ফিরায়ে নিতেছ শক্তি হে কৃপণা চক্ষু কর্ণ থেকে।" কিন্তু তাতে তাঁর ক্ষোভ নেই। আসক্তির ডালি কাঙালের মত আর ভরবার আকাঙ্ক্ষা নেই। জীবন ভোজের উচ্ছিষ্টের দিকে তিনি ফিরে চাইতে ইচ্ছুক নন—যদিও সেই ভোগকে তিনি অবজ্ঞা করেন না, মাটির ঋণ অস্বীকার্য্য নয়। কারণ তারই ভিতর দিয়ে জীবনাতীতের সন্ধান বারবার পেয়েছেন। যে জীবনের বাহ্যিক আবরণ ভেঙ্গে যাবে, ক্ষয় হয়ে যাবে, তারই অন্তরালে আনন্দ স্বরূপ লুকান আছে। এই বিশ্ব প্রকৃতি থেকে জীবন থেকেই রস আহরণ করে সে উজ্জ্বল হয়েছে। "সুধা তারে দিয়েছিল আনি, প্রতিদিন চতুর্দিকে রসপূর্ণ আকাশের বাণী"। প্রত্যুত্তরে নানা ছন্দে গেয়েছে সে "ভাল বাসিয়াছি, সেই ভালবাসা মোরে তুলেছে স্বর্গের কাছাকাছি, ছাড়ায়ে তোমার অধিকার।"

জীবনের দুটি দিক আছে, একটি তার বাহ্যিক ভোগে লিপ্ত হয়ে সন্তুষ্ট। আর একটি তার অন্তরের গতি যা সমস্ত বহিরঙ্গ

প্রকাশের ভিতর দিয়ে নিজেকে প্রসারিত করে আত্মিক লোকে যেখানকার স্পর্শ অনির্বচনীয়। যেখানে জীবন লোভে ক্ষোভে চঞ্চল তার সেই বাসনার ব্যগ্রমুষ্টিতে মানব জীবনের পূর্ণ মহিমা ধরা পড়ে না। ভ্রষ্ট হয়ে যায়। তাই—

"ক্ষুব্ধ যারা লুব্ধ যারা মাংসগন্ধে মুগ্ধ যারা একান্ত আত্মার দৃষ্টিহারা"—তাদের কাছে "অসীমের আত্মীয়তা" প্রকাশিত নয়। তাদের কাছে "অধরা অদেখা দূত ভাষাতীত" কথা বলে যাবার সুযোগ পায় না।

অর্থাৎ ধরা যাক, যার মনে কালোবাজারের চক্রান্ত ঘুরছে, পলিটিক্সের কূটনীতি যার মনকে সর্বদা পাক দিচ্ছে, বিষয়কর্ম মামলা মকদ্দমা যাদের সমস্ত মন জুড়ে আছে, স্বার্থ সাধনের পরামর্শে যে সর্বদা লিপ্ত—সে কখন দেখতে পাবে "পেলব শেফালিকায়" কী অসীমের ইঙ্গিত বাহিত হয়ে এসেছে ?

"যবে আলোতে আলোতে লীন হোত জড় যবনিকা, পুষ্পে পুষ্পে তৃণে তৃণে রূপে রসে সেইক্ষণে যে গূঢ় রহস্য দিনে দিনে নিঃস্বসিত"—তার স্পর্শ পাবার তাদের অবসর কোথায় ? চেতনাই বা কোথায় ?

অর্থাৎ মানুষ তার জৈব স্বার্থ সাধনের সীমাকে পার হলে তবেই এমন ঐশ্বর্য্যের সন্ধান পায় যা তাকে স্বর্গের কাছাকাছি নিয়ে যেতে পারে। মর্তে সেই স্বর্গলাভ করতে হলে আসক্তি লালসার বন্ধন থেকে মুক্তি চাই। তাহলে এই মাটির পৃথিবীতেই সেই সম্পদ লাভ করা যাবে। কারণ—

ইন্দ্রের ঐশ্বর্য নিয়ে হে ধরিত্রী আছ তুমি জাগি
ত্যাগীরে প্রত্যাশা করি, নির্লোভেরে সঁপিতে সম্মান
দুর্গমের পথিকেরে আতিথ্য করিতে তব দান।

পৃথিবীর জীবলীলার আনন্দকে তিনি অস্বীকার করেন না। ত্যাগী ত্যাগের দ্বারা যে ঐশ্বর্য লাভ করে, নির্লোভের যে সম্মান প্রাপ্য, তা এই ধরিত্রীরই দান। অর্থাৎ সেই সেই কর্ম সেই সেই ভাব তাদের মধ্যেই বহন করে এনেছে তার পুরস্কার। ত্যাগীর যে আনন্দ ত্যাগের কর্মে, স্বার্থপর তার সন্ধানই পাবে না। অতএব এইখানেই চতুর্দিকের বিশ্ব প্রকৃতির মর্ম থেকে যে সুধা যে আনন্দ রস উদ্বেলিত—তা ধারণ করবার মত অঞ্জলি সকল মানুষের নয়। স্বার্থ সাধনের ক্ষুদ্র পথে দৃষ্টি যাদের আবিল তারা এই পৃথিবীর 'আবর্জনা কুণ্ড' ঘিরেই কাড়াকাড়ি হানাহানি করতে লাগল—মর্ত্যের মধ্যেই যে অমরাবতীর দরজা সেখানে পৌঁছল না।

এই বিশেষ কথাটী ছাড়াও এই কবিতায় ও এ সময়ে রচিত অনেক কবিতার মধ্যেই আর একটি তত্ত্ব বাণী আমরা পাই। সে সম্বন্ধে দু একটি কথা সংক্ষেপে বলব। কবি বল্লেন মর্তের প্রতি "প্রতিদিন চতুর্দিকের রসপূর্ণ আকাশের বাণী" যে ভালবাসা জাগিয়েছিল, যে ভালোবাসা পৌঁছে দিয়েছিল তাঁর অনুভূতিকে স্বর্গের কাছাকাছি সে নষ্ট হবার নয়, সে "সব ক্ষয় ক্ষতি শেষে অবশিষ্ট রবে।" এ কথা একদিক থেকে তাঁর সৃষ্টি সম্বন্ধে সত্য বটে। সেই যে তাঁর বিপুল গভীর

অনুভবের আনন্দ তা তাঁর নানা শিল্প সৃষ্টিতে সুরে ছন্দে গানে অনশ্বর হয়ে রইল ভবিষ্যত মানবের জন্য। কিন্তু এ কথা কবির বক্তব্য নয়। এই সময়ে রচিত নানা কবিতায় আমরা নানাভাবে অন্য একটি কথা পাচ্ছি—

"তবু সে অমৃতরূপ সঙ্গে রবে যদি উঠি জেগে
মৃত্যু পরপারে।"

অর্থাৎ এ জীবনের যা অকিঞ্চিৎকর, যা পুঞ্জীভূত জঞ্জাল, যা জড়, মৃত্যুতে তা চুকিয়ে দিয়েও জীবনের যা শ্রেষ্ঠ প্রাপ্য, যার দ্বারা মানব সত্তা একটি বিশেষ পরিণতি লাভ করেছে মৃত্যুতে তা ধ্বংস হবার, লোকসান হবার নয়। নূতন অস্তিত্বের সুরু এই পরিণতির পর থেকে। যেমন ফুলের পরিণতি ফলে, সেখানে ফুল ব্যর্থ নয়, তার দানকে, অস্তিত্বকে আত্মসাৎ করেই ফলের প্রকাশ। তা না হলে মৃত্যু তো কেবলমাত্র লোকসান। যে কথা বলেছেন "মংপু পাহাড়ে" কবিতায়—

বিধাতা আপন ক্ষতি করে যদি ধার্য
নিজেরই তবিল ভাঙ্গা হয় তার কার্য।

যদি বিধাতা এমন পাগল হন তবে তা নিয়ে বিষণ্ণ হবার ইচ্ছা নেই কবির, কারণ—

এ জীবনে পাওয়াটারই সীমাহীন মূল্য
মরণে হারানটাতো নহে তার তুল্য।

যদিও কবি এ চির প্রশ্নের উত্তর পাননি, তিনি জানেন না—

দিন অবসানে মৃত্যুর অবশেষে
এ প্রাণের কোনো ছায়া
শেষ আলো দিয়ে ফেলিবে কি রং অস্তরবির দেশে
রচিবে কি কোনও মায়া ?

তবু জীবনকে যা তিনি জেনেছেন, জীবনের যে রূপ উপলব্ধি করেছেন, বিশ্ব প্রকৃতির আনন্দলীলায় যে আনন্দ অমত লাভ করেছেন "তাহার অর্থ মৃত্যুর সীমা ছাড়ায়ে গিয়াছে দূরে" তা তাঁর চিত্তকে যুক্ত করেছে এমন অসীম গভীর অনির্বচনীয় অনুভবে যা বিচ্ছিন্ন খণ্ড ও ক্ষণিক বলে বোধ হয়নি। কারণ সে কেবল বস্তু বাঁধনে আবদ্ধ নয়। সে কেবল দেহই মাত্র নয়, দেহের মধ্য থেকে দেহাতীত। সেই—

বিপুল অনুভূতি
গভীর হতে বিচ্ছুরিত আনন্দময় দ্যুতি।

দেহের সঙ্গেই শেষ হবার নয়। তাই কবি বলেছেন—

যে-দেহেতে রূপ নিয়েছে অনির্বচনীয়, সকল প্রিয়ের মাঝখানে যে প্রিয় পেরিয়ে মরণ, সে মোর সঙ্গে যাবে কেবল রসে, কেবল সুরে, কেবল অনুভাবে।

এই দেহকে অবলম্বন করে জীবন লীলার বিচিত্র অনুভূতির ভিতর দিয়ে যে পরিণত অস্তিত্ব তৈরী হয়েছে, এই যবনিকার অন্তরালে আবার কি সেইখান থেকে সুরু হবে ! "তাই তবু সে অমৃতরূপ সঙ্গে রবে যদি উঠি জেগে মৃত্যু পরপারে" ?

'বিশ্ব প্রকৃতির সৌন্দর্য্য ও জীবনলীলার আনন্দরসের ভিতর

দিয়ে কবি আপন সত্বাকে পূর্ণ করে তুলছিলেন নানাভাবে তাই তারা এত সত্য হয়ে উঠেছিল তাঁর জীবনে। যেমন বিশ্ব প্রকৃতি তার রূপের সম্ভার নিয়ে প্রবেশ করত কবির আনন্দ চৈতন্যে, তেমনি মানুষের সুখ দুঃখ বিচিত্র অনুভূতির স্পর্শ কিছুই ফেলা যেতনা। মানুষের সুখে দুঃখে আনন্দে বেদনায় তরঙ্গিত এই পৃথিবীকে পূর্ণভাবে তিনি গ্রহণ করেছিলেন জীবনে। তাই সামান্যতম মানুষও তাঁর কাছে সামান্য ছিল না, তার মধ্যে যা কিছু অকিঞ্চিৎকর তাকে অতিক্রম করে তার অন্তরতম প্রকৃতির গভীরতায় প্রবেশ করত তাঁর দৃষ্টি। সেজন্য ছোট বড় দেশ ও জাতির গণ্ডি তাঁকে আড়াল করতে পারতনা—"সর্বমানব-চিত্তের মহাদেশে" নিজেকে প্রসারিত করেছিলেন। জীবনকে সর্বদিক থেকে এই পরিপূর্ণরূপে গ্রহণের দ্বারাই তাঁর বিরাট প্রতিভা দিনে দিনে উজ্জ্বলতর হয়ে উঠতে পেরেছিল।

শেষ দিকে শরীর যখন জীর্ণ হয়ে এসেছে, কর্ণ বধিরতার দিকে চলেছে, দৃষ্টিশক্তি হয়েছে ক্ষীণ, তখনও দেখেছি জীবনে রসের পাত্রটী পূর্ণ রয়েছে। "আমি যে সব নিতে চাইরে। আপনাকে ভাই মেলব যে বাইরে" এই ভাব নিয়েই বিশ্ব-প্রকৃতি ও বিশ্বমানবের দিকে নিজেকে প্রবাহিত করেছিলেন শেষ দিন পর্য্যন্ত। প্রকৃতি ও মানুষের প্রসঙ্গে দুটি সামান্য ঘটনা আজ মনে পড়ছে। আমরা যে জগৎ সম্বন্ধে কত উদাসীন সে কথা তাঁর কাছে এলে ভাল করে বুঝতে পারতুম। যে পাহাড়, যে অরণ্য, যে আকাশ, যে তৃণগুল্ম আমাদের চোখেও

পড়েনা, অতিপরিচয়ের অভ্যাসবশত যাদের অস্তিত্ব অনেক সময় খেয়ালই করিনা তাঁরা তাঁর দৃষ্টিতে পেত চরম সম্মান। কতদিন দেখেছি পাহাড়ের দিকে চেয়ে স্তব্ধ হয়ে বসে আছেন ঘণ্টার পর ঘণ্টা, সূর্য্যালোক এসে পড়েছে গায়ের উপর। সে কথা লিখেছেন—

"কেটে গেছে বেলা শুধু চেয়ে থাকা মধুর মৈতালিতে
নীল আকাশের তলায় ওদের সবুজ বৈতালিতে।"

একদিন বল্লেন, "বসে বসে আমি দেখি এই পাহাড়ের উপর আলোছায়ার লীলা, ওই বৃহৎ গাছের ডালে ডালে রৌদ্রের লুকোচুরি, দেখে দেখে আমার চোখের আর তৃপ্তি নেই। একটা তাই বড় ভয় করে, দৃষ্টি তো ক্ষীণ হয়ে আসছে, যদি অন্ধ হয়ে যাই, তাহলে এ রূপ দেখবে কে? এই আনন্দময় ভুবন তোমার দেখবে কে?"

এই দেখার শক্তিতে তিনি প্রকৃতি থেকে নিতেন রস, আর মানবজীবন থেকে সত্য। সেই সত্য দৃষ্টি কতদূর পর্য্যন্ত প্রসারিত হত তা ভাবতে গেলে আশ্চর্য্য বোধ হয় এবং এ সম্বন্ধে বহু কথা মনে পড়ে। পঁচিশ বৎসর পূর্বে যখন জাপানে গেলেন, যখন জাপান নূতন সভ্যতার মত্তপান করে সদ্য জেগে উঠেছে, তখন তার সমস্ত আপাত গৌরব ও সৌন্দর্যমহিমাকে অতিক্রম করে তিনি তার সুদূর ভবিষ্যতের পরিণতি দেখতে পেয়েছিলেন। উচ্চারণ করেছিলেন সাবধান বাণী। সে সব কথা আজ আশ্চর্য রকমে সত্য হয়েছে। স্বদেশের রাষ্ট্রজীবনেও তাঁর বহু ভবিষ্যত

বাণীকে আমরা পরে সত্য হতে দেখেছি, এ বিষয়ে যদিও বিস্তারিত উদাহরণ দেবার আলোচনা করবার এখন সময় হবেনা কিন্তু যেমন বড় বড় বিষয়ে, তেমনি ব্যক্তিগত ঘরোয়াভাবেও তিনি যেন একটি আশ্চর্য্য দূরপ্রসারী দৃষ্টি দিয়ে মানুষের অন্তস্তল পর্য্যন্ত দেখতে পেতেন। একটি দিনের ঘটনা মনে পড়ছে। তখন কবি দারুণ অসুস্থ, রোগশয্যায় অর্দ্ধ অচৈতন্যে কাটছে দিন রাত্রি। জোঁড়াসাঁকোর বাড়িতে অনেকেই তাঁকে দেখতে আসতেন। একদিন সকালবেলায় একটি মেয়ে দেখা করতে এসেছিলেন, বা তাঁকে দেখতে এসেছিলেন। কবি তখন চোখবুজে অর্দ্ধশায়িত ক্লান্ত রুগ্ন দেহে তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে আছেন। তিনি এসে নীরবে প্রণাম করে দাঁড়ালেন। কবি একটিবার চোখ খুলে তার দিকে চেয়ে আবার চোখ বুজলেন। একটু পরে মেয়েটি চলে গেল। কবি জড়িত স্বরে কি বলছেন কাণ পেতে শুনি। "এর কি মনে সুখ নেই? একি সংসারে শান্তি পাচ্ছে না?" একবার এ প্রশ্ন করেই আবার তাঁর রোগের ক্লান্তিতে আচ্ছন্ন মগ্নচৈতন্য হয়ে রইলেন। আমি জানতুম তাঁর এ অনুমান সত্য। কিন্তু স্তম্ভিত হয়ে ভাবতে লাগলুম—এই অবস্থায় এমন চকিতের মধ্যে এক নিমেষের দৃষ্টিতে তিনি কি করে ঐ বালিকার অন্তস্তল পর্য্যন্ত দেখতে পেলেন।

এই দু'চোখ ভরে দেখা, এই সমস্ত জীবন ভরে দেখা এবং জীবনকে উত্তীর্ণ করে দেখবার অসীম শক্তিই তাঁর প্রতিভাকে এমন প্রাণবান জ্যোতিষ্মান করে তুলেছিল।

যাঁকে উদ্দেশ্য করে তিনি লিখেছিলেন ঃ—

হে মোর দেবতা ভরিয়া এ দেহ প্রাণ
কী অমৃত তুমি চাহ করিবারে পান ?
আমার নয়নে তোমার বিশ্ব ছবি
দেখিয়া লইতে সাধ যায় তব কবি—
আমার মুগ্ধ শ্রবণে নীরব রহি
শুনিয়া লইতে চাহ আপনার গান।

সেই তাঁর জীবন দেবতা তাঁর দেহের ভিতর দিয়ে আপন সৃষ্টিকে আশ্চর্য্যরূপে উপলব্ধি করেছিলেন।

আজ শেষ করবার পূর্বে বলি, মংপু ও কালিংপং-এ তাঁর জন্মোৎসব করবার একটি বিশেষ সার্থকতা আছে। তাঁর শেষ জীবনের শেষ ক'টি দিন এই স্থান থেকে তিনি আনন্দরস ও বিশ্রাম অনুভব করেছিলেন—জীবনের শেষ পাত্রটী পূর্ণ করেছিলেন সুধায়। এই পাহাড় ও দিগন্তের নীলিমা, এই অরণ্যের শ্যামলিমা, এই নদীর বিস্তীর্ণ কোমল রেখা সেই মহামানবকে প্রাকৃতিক শেষ অর্ঘ্য নিবেদন করেছে।

"হলদে ফুলের গুচ্ছে মধু খোঁজে বেগুনি মৌমাছি
মাঝখানে আমি আছি।

* * *

চৌদিকে আকাশে তাই দিতেছে নিঃশব্দ করতালি
আমায় আনন্দে আজ একাকার ধ্বনি আর রঙ,
জানে তা কি এ কালিংপং ?"

রবীন্দ্রনাথের অহিংসা

আজ এই নৃশংস দাঙ্গা হাঙ্গামার ফলে যে একটি মাত্র কথা ভারতবর্ষে প্রত্যেক লোকের মনে আন্দোলিত হচ্ছে সে সম্বন্ধে নানারকম জনমত কখনো খবরের কাগজের পাতায়, কখনো মুখে মুখে, নানা তর্কে যুক্তিতে, কখনো বা যুক্তিহীন আবেগে, নানা রূপ ধারণ করছে। এই রকমই এক আবেগ উচ্ছ্বাসে এক ভদ্রলোক বললেন—এ যুগে হিন্দুজাতির মহা অনিষ্টকারী রবীন্দ্রনাথ ও শ্রীচৈতন্য। কেবল প্রেম আর কবিত্ব, গান আর সুর, সৌন্দর্য্যকলার মহরা দিতে দিতে বাঙ্গালীর ছেলে আর হাতিয়ার ধরতে পারে না ইত্যাদি। যিনি বলছিলেন তিনি একজন বিদ্বান পদস্থ ব্যক্তি, যাঁরা শুনছিলেন ও সায় দিচ্ছিলেন তাঁরাও তদ্রূপ। এঁদের রায় শুনে মনে হল শ্রীচৈতন্য ও রবীন্দ্রনাথ উভয়েরই একান্ত কর্তব্য ছিল সমস্ত দেশকে ছুরিতে শান দিতে শিক্ষা দেওয়া। দৃষ্টান্ত স্বরূপ তাঁরা যাঁদের উল্লেখ করলেন তাদের কার্য্যকলাপ যদি তাঁদের নেতাদের শিক্ষা দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত ও চালিত হয়ে থাকে তবে ধন্য সেই নেতৃবর্গ। জাতির চরিত্রকে নষ্ট করে যাঁরা জাতি বা সম্প্রদায়ের মঙ্গল সাধন করতে চান তাঁদের সে ভুল আজ দেশকে কোন দুর্দশায় নিয়ে এসেছে

তা আমরা দেখতে পাচ্ছি। প্রয়োজন সিদ্ধির উদ্দেশ্যে অবিমিশ্র প্রশ্রয় ও পাপে ঘৃতাহুতির দ্বারা যে সর্বনাশ ও উচ্ছৃঙ্খলা আজ একদল তথাকথিত নেতা দেশের মধ্যে জাগিয়ে তুলেছেন সেই ভয়ঙ্কর বীভৎসতার দিকে তাকিয়ে মনে হয় জয়লাভের আশার তুল্য বীভৎস হয়ে ওঠার চেষ্টা কোনো ক্রমেই হিতকর হতে পারে না।

রবীন্দ্রনাথকে যথার্থভাবে জানতে গেলে, বিশেষ ক'রে আধুনিক বঙ্গদেশের রচয়িতা বলে জানতে গেলে, তাঁর সমাজ সম্বন্ধীয় ও রাজনৈতিক প্রবন্ধগুলির সবিশেষ আলোচনা প্রয়োজন। যদিও আলোচ্য অনেক সমস্যাই এখন অসাময়িক হয়ে গিয়েছে, তা সত্ত্বেও নানা দিক থেকে তা আমাদের বর্তমান জীবনে আলো ফেলতে পারে। কারণ কোনো সমস্যারই সাময়িক সমাধান তাঁর কাছে চূড়ান্ত ছিল না। তার অন্তর্নিহিত মূল কারণের প্রতি লক্ষ্য রেখে মনুষ্যত্বের চিরন্তন সত্য নীতির দ্বারা বিচার করতে চাইতেন। তাই যে ঘটনাগুলিকে উপলক্ষ্য ক'রে তাঁর চিন্তা এই প্রবন্ধগুলিতে বিকীর্ণ হয়েছে তা ঐ বিশেষ ঘটনাগুলিকে অতিক্রম ক'রে ভবিষ্যত কালের অনাগত সুখ দুঃখের উপরও আলোক রেখা পাত করেছে। এই প্রবন্ধগুলি আলোচনা করলে আমরা বারবার বিশেষ করে একটি মত দেখতে পাই যে অন্যায়কে আশ্রয় করে কোনো মঙ্গল গড়ে উঠতে পারে এ তিনি একেবারেই বিশ্বাস করতেন না। এবং "ভালো মন্দ যাহাই আসুক সত্যেরে লও সহজে" এই নীতিই তিনি মানুষ ও জাতি গড়ে তোলবার

পক্ষে মূল নীতি বলে মনে করেছিলেন। সুবিধা ও সুযোগ অনুসারে জনমনের রুচি অনুযায়ী সুপথ্য পরিবেশন তিনি করেন নি। হিতং মনোহারী চ দুর্লভং বচঃ—দুর্লভ তাঁর বচন আপাত মনোহারী হোক বা না হোক হিতের প্রতিই লক্ষ্য রেখেছে। যে যুগে রবীন্দ্রনাথ লেখনী ধরেছিলেন সে যুগে আমাদের দেশ একটি পরম সন্ধিক্ষণে এসে দাঁড়িয়েছে। একদিকে তাঁর পুরাণো সংস্কার অন্ধতা মূঢ়তার অচলায়তন গড়ে রেখেছে আর একদিকে পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রবল আকর্ষণ অন্ধ অনুকরণে দেশের শিক্ষিত সমাজের চিত্তকে মোহাবিষ্ট করেছে। ভারতবর্ষের অন্তরে যে আলোকবর্ত্তিকা তার আপন স্বাতন্ত্র্যে উজ্জ্বল, একদল তাকে বিস্মৃত হয়েছেন, অন্যদল তার সন্ধানই পান নি।

রবীন্দ্রনাথ কোনো জটিল নূতন মত বা "ism" এর সৃষ্টি করলেন না—তিনি আমাদের শোনাতে চাইলেন ভারতবর্ষেরই চিরন্তন বাণী—যার অর্থ ও তাৎপর্য্য আমরা বিস্মৃত হয়েছিলুম—কোথায় আমাদের শক্তির উৎস, কি আমাদের ধর্ম, কোথায় আমাদের জাতির প্রাণ। তা তিনি নানা যুক্তি নানা বিচারে আমাদের বোঝাতে চেষ্টা করলেন—এবং তর্জনী নির্দেশ করলেন সমস্ত ছিদ্রপথে যেখান দিয়ে শনি প্রবেশের দ্বার আছে। ভারতবর্ষের যে চিরকালীন সাধনা, যে ধর্ম, যে আদর্শ পুরাতন সংস্কারের মধ্যে জড়ীভূত ও আবদ্ধ হয়েছিল। নূতন জীবনের বেগের সঙ্গে, বর্তমান কালের অবস্থান্তরের সঙ্গে তাকে তিনি সংগত করে নিতে চাইলেন। নূতন শিক্ষা, নূতন কর্ম এবং নূতন

জাতীয়তাবোধের মধ্যেও যা চিরন্তন ধর্ম তার সমন্বয় ক'রে আধুনিক রাষ্ট্রনীতির সঙ্গে ব্যক্তিগত ধর্মনীতিকে তিনি যুক্ত করতে চাইলেন। ইয়োরোপীয় রাষ্ট্রনীতি যে বিরোধ ও বিদ্বেষের উপর ভিত্তি স্থাপন করতে অভ্যস্ত, ভারতবর্ষের মিলনমূলক আদর্শ, আশু উদ্দেশ্য সিদ্ধির পক্ষে তার চেয়ে কম উপযোগী হলেও উভয়ের তুলনায় তার কল্যাণরূপকে তিনি বোঝাতে চেয়েছেন।

রাষ্ট্রিক বা সামাজিক সমস্ত সমস্যারই একেবারে মূলে তিনি দৃষ্টিপাত করতেন। আত্মহিত বা জাতিহিতের মোহে কোনো ক্ষণিক সমাধান খুঁজতেন না। জাতি গঠনের দায়িত্ব নিয়ে তিনি সত্য পথকে অনুসন্ধান করে ফিরতেন এবং অরুচিকর হলেও সে সত্যকে উদ্‌ঘাটিত করতে কুণ্ঠিত হতেন না। কাজেই যখন হিন্দুমুসলমানের বিরোধের সমস্যা ঘনীভূত হয়ে উঠল তখন তৃতীয় পক্ষের উপর তার সমস্ত বোঝা চাপিয়ে তিনি নিশ্চিন্ত হতে পারেন নি। আমাদের নিজেদের মধ্যে যেখানে অন্যায় আছে সেই গহ্বরের প্রতি তর্জনী নির্দেশ করেছেন। তৃতীয় পক্ষ আমাদের হাতে নেই—তাদের বিরত করা হয়ত আমাদের সাধ্যাতীত কিন্তু আমরা তো আমাদের হাতে আছি। "আজ আমরা সকলেই এই কথা বলিয়া আক্ষেপ করিতেছি যে ইংরেজ মুসলমানদিগকে হিন্দুর বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিয়া দিতেছে, কথাটা যদি সত্য হয় তবে ইংরেজের বিরুদ্ধে রাগ করিব কেন? দেশের মধ্যে যতগুলি সুযোগ আছে ইংরেজ তাহা নিজের দিকে টানিবেনা ইংরেজকে আমরা এতদূর নির্বোধ বলিয়া নিশ্চিন্ত

হইয়া থাকিব এমন কি কারণ ঘটিয়াছে? মুসলমানকে যে হিন্দুর বিরুদ্ধে লাগান যাইতে পারে এই তথ্যটাই ভাবিয়া দেখিবার বিষয়, কে লাগাইল সেটা তত গুরুতর বিষয় নহে। আমাদের মধ্যে যেখানে পাপ আছে শত্রু সেখানে জোর করিবেই। আজ যদি না করে তো কাল করিবে, এক শত্রু না করে অন্য শত্রু করিবে। অতএব শত্রুকে দোষ না দিয়া পাপকেই ধিক্কার দিতে হইবে।···দেশের যে একটি বাস্তব সত্যকে আমরা মূঢ়ের মত না বিচার করিয়াই দেশের বড়ো বড়ো কাজের আয়োজনের হিসাব করিতেছিলাম একেবারে আরম্ভেই ইংরেজ তাহার প্রতি আমাদের দৃষ্টি ফিরাইয়া দিয়াছে। যাহা প্রকৃত যেমন করিয়া হউক তাহাকে আমাদের বুঝিতেই হইবে।”

সত্যকে এড়িয়ে চলবার কোনো পন্থা নেই—তাই শত্রুর সুবুদ্ধির উপর নির্ভর না ক'রে নিজেদের দুর্গেরই সমস্ত ছিদ্র পথ রুদ্ধ করতে হবে। প্রয়োজন সিদ্ধির ও স্বার্থের প্রলেপে নয়, সত্যে যার মূল প্রসারিত নিঃস্বার্থতায় ও মনুষ্যত্বে যা মহৎ সেই ঐক্যবুদ্ধির দ্বারা। দুর্যোগ যখন ঘনিয়ে উঠল তখন তিনি যে সমাধানের সন্ধান করলেন সে দায়োদ্ধারের খাতিরে নয়—রাজনৈতিক সুবিধার উদ্দেশ্যে নয়, মনুষ্যত্বের জন্য, কল্যাণের জন্য। ঐক্যের জন্যই ঐক্য প্রয়োজন, প্রীতির জন্যই প্রীতি। প্রয়োজনের উপরে উঠলে স্বার্থকে অতিক্রম করলে তবেই যা বড় যা মহৎ এবং যা যথার্থই মঙ্গলজনক তার সন্ধান পাওয়া যায়, এই ছিল তাঁর মত। কারণ ধর্ম নহে সম্পদের হেতু—“হিন্দু

মুসলমান এক হইলে পরস্পরের কত সুবিধা একদিন কোনো সভায় তাহাই বুঝাইয়া বলা হইতেছিল। তখন আমি এই কথাটি না বলিয়া থাকিতে পারি নাই যে সুবিধার কথাটা এ স্থলে মুখে আনিবার যোগ্য নহে। দুই ভাই এক হইয়া থাকিলে বিষয়কর্ম ভাল চলে কিন্তু সেইটাই দুই ভাই এক হইয়া থাকিবার প্রধান হেতু হওয়া উচিত নয়। কারণ ঘটনাক্রমে সুবিধার গতি পরিবর্তন হওয়াও আশ্চর্য্য নহে।······আমরা উভয়ে একদেশের সন্তান, আমরা ঈশ্বরকৃত সেই ধর্মের বন্ধনবশতঃ শুধু সুবিধা নহে অসুবিধাও একত্রে ভোগ করিতে প্রস্তুত না হই তবে আমাদের মনুষ্যত্বে ধিক্।"

যেমন পরের প্রতি দোষারোপের দ্বারা নিজেদের ত্রুটিকে তিনি এড়িয়ে যেতে চান নি—তেমনি খুঁজে ফিরেছেন আরোগ্যের পথ—এই আত্মদোষ দর্শন ও যথার্থ সমালোচনার দ্বারাই যেমন ব্যক্তি বিশেষের তেমনি জাতীয় চরিত্র গড়ে উঠবার সুযোগ পায়—এ কথা অস্বীকার করা যায় না। কেবলমাত্র সুবিধার চর্চা, আত্মদোষ গোপন ও তৃতীয় পক্ষের প্রতি দোষারোপের দ্বারা যে সাম্প্রদায়িক ঐক্য বন্ধন সৃষ্টি হয় তৃণাচ্ছাদিত কূপের উপর তার ভিত্তি। সুবিধার পট পরিবর্তন হলেই তা ধূলিসাৎ হতে বাধ্য। সমগ্র রবীন্দ্র সাহিত্য এবং ভারতবর্ষের চিরকালের সাধনা কোথাও আমাদের পরের প্রতি বিদ্বিষ্ট হতে বা আপাত সুবিধাকেই চরম সত্য বলে গ্রহণ করতে শিক্ষা দেয় না। তাই আজও আমাদের নেতারা জনমত অগ্রাহ্য করে প্রবৃত্তির উন্মত্ত

ঝটিকা তুচ্ছ করে যা সত্য যা মঙ্গল তা নির্দেশ করতে কুণ্ঠিত হন না। প্রতিশোধের অস্ত্র উদ্যত হলে তাঁরা নিজেরা বুক পেতে দিতে অগ্রসর হন। তার দ্বার তাঁরা আমাদের রক্ষাই করেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য তাদের, যাদের পাপ লোভের প্রশ্রয় পায়। নেতা যখন ধর্মবুদ্ধির উপর জাতিকে প্রতিষ্ঠিত রাখতে সাহস পান না, সুযোগের অনুসন্ধানে লোকপ্রিয়তার দাস্য করেন তার চেয়ে দুর্ভাগ্য একটি জাতি বা সম্প্রদায়ের আর কিছু হতে পারে না। বস্তুত আমাদের লেশমাত্র দোষ নেই একথা মনে করতে যে আরাম যে সান্ত্বনা আছে তার প্রতি লোভ বশত যে জাতি নিজের সমস্ত ত্রুটি ও অন্যায়ের প্রতি উদাসীন হয়ে, অন্ধ হয়ে আপনাকে ছলনা করতে দ্বিধা বোধ করে না তাদের প্রতি মনে আর যে ভাবই পোষণ করি না কেন তাদের অনুকরণের প্রবৃত্তি যেন আমাদের না জাগে।

আজ এই দুর্যোগ মথিত গাঢ় অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে রবীন্দ্রনাথের সেই প্রশ্ন একটি বিরাট জিজ্ঞাসার চিহ্ন নিয়ে ফুটে উঠছে মনের সামনে যে, জাতীয় চরিত্র নষ্ট করে কি জাতীয় মঙ্গল সাধন সম্ভব? এই চরিত্রের প্রতি দৃষ্টি রেখেই গড়ে উঠেছে রবীন্দ্রনাথের অহিংস নীতি, সে কোনো কবিত্বের আবেগ বা বিশেষ একটি ধর্মমতের মন্ত্র নয়—মানব চরিত্রের চিরন্তন ন্যায়ধর্মের প্রতি বিশ্বাসেই তার প্রতিষ্ঠা। সেই ধর্ম-বাহিত পথ দুর্গম এবং তাতে পৌরুষেরও প্রয়োজন। উচ্ছৃঙ্খল ইচ্ছার উদ্দামতার মধ্যে অন্যকে আঘাত ক'রে, হনন্ ক'রে, নিজেকে

বাড়িয়ে তোলার যে প্রবৃত্তি, ত্যাগের দ্বারা, সাধনার দ্বারা তাকে উত্তীর্ণ হয়ে অন্যায়কে প্রতিরোধ করার শক্তিকে লাভ করাই সেই ধর্মের প্রয়াস।

ইয়োরোপীয় জাতীয়তাবোধ যে বিরোধমূলক আদর্শের উপর স্থাপিত ভারতবর্ষের সাধনার সঙ্গে তার পার্থক্য বিশেষভাবে আলোচনা করে তিনি উভয় সভ্যতার মূলগত প্রভেদ স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। "ইয়োরোপীয় নেশনতন্ত্রের মেরুদণ্ডই স্বার্থে এবং স্বার্থের সংঘাত মানুষকে অন্ধ করিবেই। গায়ের জোর, ঠেলাঠেলি, অন্যায় ও সর্বপ্রকার মিথ্যাচারের হাত হইতে নেশনতন্ত্রকে উপরে তুলিতে পারে এমন সভ্যতার নিদর্শন তো আমরা এখনও য়ুরোপে দেখিতে পাই না।" এবং সেই য়ুরোপীয় বিদ্যালয়ের শিক্ষাই আজ সমস্ত এশিয়ার মনে প্রবেশ করে বিদ্বেষ, মিথ্যাপবাদ, সত্য গোপন ও হিংসার দ্বারা শুধু যে এক নেশনের বিরুদ্ধে আর এক নেশন তা নয়, এক সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আর এক সম্প্রদায়, এক দেশ ও প্রদেশের সঙ্গে অন্য দেশ ও প্রদেশ এবং নানা ছোট ছোট গণ্ডীতে, ছোট ছোট ভাগে ক্ষয় ক্ষতি ও সর্বনাশের মূল বিস্তার করছে। "শিশুকাল হইতে ভিন্ন জাতির সহিত বিরোধভাবের একান্ত চর্চা প্যাট্রিয়টির সাধনা। হিন্দু জাতি সেই পোলিটিক্যাল বিরোধভাবের চর্চা করে নাই বলিয়াই নষ্ট হইয়াছে—পূর্বোক্ত কথাটি যদি একান্তই স্বীকার করিতে হয় তবে সে সঙ্গে একথাও বলিব আত্মরক্ষাই মানুষের অথবা সম্প্রদায়ের একমাত্র সর্বোচ্চ ধর্ম নহে।"

আপাত দৃষ্টিতে যা পরম লাভ বলে মনে হয় তাই মানুষের চরম লাভ নয়।

সেজন্য রবীন্দ্রনাথের মতে, জাতীয় স্বার্থের খাতিরেও অন্যায় যদি করতেই হয় তবে তাকে অন্যায় বলেই জানতে হবে। অধর্মকে ডেকে এনে দেবতার আসনে বসান চলবে না। রূপকথার দৈত্যের মত একবার রাজ সিংহাসন পেলে জাতির হৃদয়ে স্থায়ী আসন নেবে। অশুভ প্রবৃত্তি জাগ্রত করে তুললে প্রয়োজন সিদ্ধি করেই সে অন্তর্দ্ধান করবে না। তাই আমাদের ধর্ম, আমাদের শাস্ত্র, আমাদের গুরু এই শিক্ষাই দিয়ে থাকেন যাতে আমরা সহিষ্ণু হই, ন্যায়কে উদ্দেশ্য সিদ্ধির চেয়ে বড় বলে জানি তাতে আমাদের বিনাশ কখনই হতে পারে না। ভীষণ বর্বরতাকে ভীষণতম প্রতিযোগিতায় পরাস্ত করাই মঙ্গলের একমাত্র উপায় নয়।

কিন্তু দুর্বলের যে ভীরুতা ও ধার্মিকের যে সহিষ্ণুতা, প্রেমের যে ক্ষমা এ সব এক নয়। রবীন্দ্রনাথের অহিংসা এই সহিষ্ণুতাকে প্রধান সহায় করে ন্যায়নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। অপ্রমত্ত হয়ে যে অস্ত্র নির্বাচন, অধিকারীর যে যুদ্ধ, তাকে তিনি হিংসার পর্য্যায়ে ফেলেন না। "যখন অন্যায় করিয়া কেহ আমাকে অপমান করে তখন যতটুকু আমার সামর্থ্য আছে তৎক্ষণাৎ তাহার প্রতিকার করিয়া জেলে যাওয়া এবং মরাও উচিত।...... অন্যায় দমন করিবার জন্য প্রত্যেক মানুষের যে স্বর্গীয় অধিকার আছে যথাসময়ে তাহা যদি না খাটাইতে পারি তবে মনুষ্যের নিকট

হেয় ও ধর্মের নিকট পতিত হইব। নিজের দুঃখ ও ক্ষতি আমরা গণ্য না করিতে পারি কিন্তু যাহা অন্যায় তাহা সমস্ত জাতির প্রতি ও সমস্ত মানুষের প্রতি অন্যায়। বিধাতার ন্যায়দণ্ডের ভার আমাদের প্রত্যেকের উপরই আছে। ন্যায়নীতির সীমার মধ্যে নিজেকে সংবরণ করিয়া দুষ্ট শাসনের কর্তব্য আমাদিগকে গ্রহণ করিতেই হইবে।"

প্রবৃত্তির হাতে আত্মসমর্পণ, ক্রোধের বশে যে হননের উদ্দামতা, তাকেই তিনি বলেন হিংসা, কিন্তু ধর্মের জন্য ন্যায়ের জন্য পাপের সঙ্গে যুদ্ধে অপ্রমত্ত মানবের চিরন্তন অধিকার।

কর্ম ও আদর্শ

গুরুদেব সম্বন্ধে কিছু বলতে অনুরুদ্ধ হয়েছি। এরকম স্থানে তাঁর সম্বন্ধে আমার কিছু শোনাতে আসা প্রগল্‌ভতার মত মনে হয়—সেজন্য সংকোচ বোধ করি। এখানে এমন অনেকে রয়েছেন যাঁরা তাঁকে দীর্ঘ দিন ধরে অন্তরঙ্গভাবে দেখবার সুযোগ পেয়েছেন। আবার অনেকে বৎসরে বৎসরে এসেছেন যাঁরা তাঁর ব্যক্তিগত সংস্পর্শ লাভ করেন নি। যাঁরা তাঁকে কখনো দেখেননি তাঁদের কাছে তাঁর অস্তিত্বের মহিমার পূর্ণ উপলব্ধি কখনই হবে না। সেই রসমূর্তি পূর্ণ মনীষা জ্ঞান ও কর্মকুশলতার কেন্দ্র হয়েও তাকে উত্তীর্ণ হয়ে থাকত আনন্দে। এত গভীর জ্ঞান এমন কর্মক্ষমতা এত গূঢ় বিচক্ষণতা যে এমন স্নেহ কৌতুকোজ্জ্বল আনন্দরসে মগ্ন থাকতে পারে তা অন্য কোনো কবির জীবনে দেখা যায় নি। গুরুদেবের বিচিত্র কর্মময় বহুমুখী প্রতিভার স্রোত নানা দিকে প্রবাহিত। তিনি যে কত বিষয়ে ভেবেছেন, কত বিষয়ে চিন্তা করেছেন, কত সূক্ষ্ম অনুভূতিতে জগতের বিচিত্রদিক তাঁর মনে আঘাত করেছে সে সম্বন্ধে ভালোরকম জানতে হলে আমাদের দীর্ঘ জীবনের সাধনা

আবশ্যক। তাঁর বিরাট রচনাসমুদ্রের মধ্যে অবগাহন করতে হবে, শান্তিনিকেতনের শ্রীনিকেতনের আদর্শ সম্বন্ধে অবহিত হতে হবে, তাঁর সারা জীবনের কর্ম সমুদ্রতীরে দাঁড়িয়ে উপলব্ধি করতে হবে সেই সার্বভৌম নরোত্তমকে। এ কাজ শক্তি ও সাধনা সাপেক্ষ। আমরা সবাই তা পারব না। সেজন্য তাঁকে পূর্ণভাবে জানা আমাদের সকলেরই হয়ত হয়ে উঠবে না। কিন্তু আমরা যারা তাঁর যুগে জন্মেছি তাঁর চিন্তাধারার মধ্যে প্রবেশ করবার সুযোগ পেয়েছি, তাঁর কর্মের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেছি আমাদের কর্তব্য অন্তত তাঁর সত্তার পরম মূল্যটি আমাদের জীবনের মধ্যে গ্রহণ করা। অন্তত এটুকু পরিচয় যেন থাকে যাতে তাঁর সার্থক জীবনের অর্থ অনুভূতির মধ্যে পাই। আজ এখানে শ্রীনিকেতনে মহিলা সমিতিতে বলতে অনুরুদ্ধ হয়েছি বলেই তিনি মেয়েদের জন্য বিশেষ কি করেছিলেন বা ভেবেছিলেন বা গ্রামের উন্নতির তাঁর কী কী পরিকল্পনা ছিল সে বিষয়েই বিশেষ করে বলব না। কারণ মেয়েরা শুনবেন বলেই যে তাঁরা কেবল নিজেদের বিষয়েই শোনবার যোগ্য একথা আমার মনে হয় না। সে যুগ চলে গিয়েছে। তাই কবি বলেছেন, "গৃহস্থালির ছোট পরিধির মধ্যে মেয়েদের জীবন যখন আবদ্ধ ছিল তখন মেয়েলি মনের স্বাভাবিক প্রবৃত্তিগুলি নিয়ে সহজেই তাদের কাজ চলে যেত। এজন্য তাদের বিশেষ শিক্ষার দরকার ছিলনা বলেই একদিন স্ত্রীশিক্ষা নিয়ে এত বিরুদ্ধতা এবং প্রহসনের সৃষ্টি হয়েছে। কালের প্রভাবে মেয়েদের জীবনের

ক্ষেত্র এই যে স্বতই প্রসারিত হয়ে চলেছে, এই যে মুক্ত সংসারের জগতে মেয়েরা আপনি এসে পড়েছে, এতে করে আত্মরক্ষা ও আত্মসম্মানের জন্য তাদের বিশেষ করে বুদ্ধির চর্চা একান্ত আবশ্যক হয়ে পড়ল। এই প্রণালীতেই আমাদের দেশের আধুনিক মেয়েদের মন ঘরের সমাজ ছাড়িয়ে প্রতিদিন বিশ্ব সমাজে উত্তীর্ণ হচ্ছে।” অতএব আজ আর মেয়েদের আলাদা করে মেয়ে বলে দেখলেই চলবে না, বুদ্ধি ও জ্ঞানে তাঁরা মানুষের যোগ্যতা অর্জন করবেন এই তিনি চেয়েছিলেন। একটা জিনিষ বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করেছি যখন যে বিষয় নিয়েই তিনি লিপ্ত হয়েছেন সংকীর্ণ ও ছোট সীমায় তা সমাপ্ত হতে পারেনি। তাঁর কথা ভাল করে বুঝবার ক্ষমতা আমাদের থাকুক বা না থাকুক তিনি যা বলেছেন বড়ো করেই বলেছেন, কারণ “বড়ো যখন ডাক দেন তখন বড় দাবী করেন, তখন মানুষ ধন্য হয়। কেননা মানুষ তখন আপন তুচ্ছতার মাঝখানে চমকে জেগে উঠে বুঝতে পারে সে বড়ো।” কোনও সঙ্কীর্ণতা কোনো আপাত কার্য্যোদ্ধারের নীতিতে তাঁর কাজ চালিত হয়নি, প্রত্যেক মানুষের প্রতি এক অন্তর্নিহিত গভীর শ্রদ্ধা নিয়ে তিনি দৃষ্টিপাত করেছেন, কে সহরের, কে গ্রামের, কে শিক্ষিত, কে অশিক্ষিত এ পার্থক্য তাঁকে প্রভাবিত করেনি, কারণ তিনি জানতেন ছোট একটি ক্ষুদ্র মানুষের মধ্যে বিশ্ব অধিকার করবার শক্তি আছে। সর্বতোভাবে সেই শক্তিকে আহ্বান ও জাগ্রত করে তোলাই তাঁর সারা জীবনের কাজ ছিল!

এই তাঁর কর্ম, সংসারের সঙ্গে বিশ্বজগতের মিলন তিনি আশ্চর্য্য উপায়ে সাধন করেছিলেন—যাতে কাজ হয়ে উঠল আনন্দ—বিদ্যালয়ের শিশু পেল ছুটি। একথা বোঝবার জন্য তাঁর জীবনলীলার প্রধান পর্য্যায়গুলির আলোচনা করা দরকার। তিনি যে বিরাট কর্মক্ষেত্র সৃষ্টি করে তুললেন তার বিশেষত্বই এই যে শুধু কর্মেই তার শেষ হল না। প্রয়োজনের বদ্ধ আয়তনের মধ্যেই তা পর্যাপ্ত নয়। তিনি এখানে উপকরণ সৃষ্টির আয়োজন করেছেন বটে, কিন্তু সে উপকরণ বস্তুর মধ্যেই শেষ হয়ে যাবে না—বস্তুকে ছাড়িয়ে থাকবে তার সৌন্দর্য্য। যা সাংসারিক প্রয়োজনীয়, তাকে তিনি উড়িয়ে দেন না—তাকে পূর্ণভাবে গ্রহণ করে তার থেকে উত্তীর্ণ হন অতিসংসারে। এই তাঁর কর্মময় জীবনের শ্রেষ্ঠ ফল। তিনি লিখেছিলেন "সাত মাস আমেরিকায় ঐশ্বর্য্যের দানব-পুরীতে ছিলেম—সেখানে ভোগের চেহারা দেখেছি, আনন্দের না, লক্ষ্মী হলেন এক, কুবের হলেন আর—অনেক তফাৎ। লক্ষ্মীর অন্তরের কথাটি কল্যাণ সেই কল্যাণ দ্বারা ধন শ্রীলাভ করে।" তাঁর সৃষ্টি এই প্রতিষ্ঠানগুলির ভিতর দিয়ে তিনি দেশের মধ্যে সেই কল্যাণ বিস্তারের চেষ্টা করেছেন, চেয়েছেন ঘটিয়ে তুলতে সেই শ্রেষ্ঠ সম্পদ যার সাহায্যে মানুষের আত্মা বড় হয়ে উঠতে পারে—শুধু জড় সম্পদের পণ্যদ্রব্য জোগাড় করা নয়। বাহ্যিক জিনিষকে বড় করে তুলতে তিনি রাজী নন, তাই 'চরকা'কে প্রতীক করে তুলতে তাঁর আপত্তি ছিল। কর্মকাণ্ডকে জ্ঞানকাণ্ডের উপরে

বসাবার তাঁর ইচ্ছেই ছিল না। সেই কর্মই সার্থক, যে কর্মের মধ্যে চিন্তার ব্যঞ্জনা আছে—যে কর্মের মধ্যে মানুষের মন পূর্ণতা পেতে পারে তা যান্ত্রিক কর্ম নয়—বদ্ধ মন নিয়ে অভ্যাসের ঘানিতে চক্র প্রদক্ষিণ নয়। সেই জন্যই কাজের সুরু থেকেই তিনি সেই দিকে দৃষ্টি ফিরিয়েছেন যেখানে কাজ শুদ্ধ অন্ন বস্ত্রের সমস্যা মেটান নয়, সৌন্দর্য্য উপলব্ধির মধ্যে সৌন্দর্য্য সৃষ্টির মধ্যে মানুষের আত্মার মুক্তি সাধনা। তাঁর সৃষ্টি এই প্রতিষ্ঠানগুলির সেই প্রধান বিশেষত্ব। এ কথাটি সংক্ষেপে বোঝান কঠিন! তাঁর জীবন ও চিন্তার সঙ্গে পরিচয় না থাকলে বোঝা যায় না। স্বদেশের যে মঙ্গল সাধনের কর্মে তাঁর সমস্ত জীবনের কর্ম উৎসর্গীকৃত সে কোনো বাহ্যিক সম্পদ সৃষ্টি করে সার্থক হবে না। জ্ঞানবান শ্রীসম্পন্ন প্রাণ যাত্রার আনন্দময় রূপকে জাগিয়ে তোলাই উদ্দেশ্য। তিনি বলেছিলেন, "ভারতবর্ষের একটিমাত্র লোকও যদি আত্মশক্তির দ্বারা সমস্ত গ্রামকে সম্পূর্ণ আপন করতে পারে তাহলেই স্বদেশকে স্বদেশরূপে লাভ করবার কাজ সেখানেই আরম্ভ হবে।" অর্থাৎ এদেশকে বুদ্ধি দিয়ে প্রাণ দিয়ে প্রেম দিয়ে ভিতর থেকে গড়ে তুলতে হবে—নৈলে শুধু বাহ্যিক সম্পদলাভের শক্তিলাভের দ্বারা হবে না। একথা নানাভাবে তিনি বুঝিয়েছেন এবং সমস্ত কর্মের মধ্যে চেয়েছেন আনন্দের স্রোত প্রবাহিত করতে, যাতে মানুষ উপলব্ধির ক্ষেত্রে তার বাস্তব জীবনের দেহসীমা থেকে বড়ো হয়ে উঠতে পারে। তার আত্মার প্রকাশ হয়।

দলে দলে নূতন নূতন লোক নানা কাজে এখানে বৎসরে বৎসরে মিলিত হবেন, নূতন নূতন কর্মপ্রবাহ নানা দিকে ধাবিত হবে, নানা প্রচেষ্টায় নানা লোকে একত্র হবেন, এর মাঝখানে তিনি আর শরীরে এসে দাঁড়াবেন না—কিন্তু সেজন্য তাঁর এই আদর্শের সঙ্গে যদি আমরা যোগ হারিয়ে ফেলি তাহলে এই প্রতিষ্ঠানের সমস্ত বিশেষত্ব নষ্ট হবে।

আমি আজ দুঃখের সঙ্গে বলছি যে এমন ছাত্রছাত্রী বয়স্ক বয়স্কা শান্তিনিকেতন ও শ্রীনিকেতনে আছেন ও ছিলেন যাঁরা এই সুযোগ পেয়েও গুরুদেবের চিন্তাধারার সঙ্গে পরিচিত হন নি—হতে চেষ্টা করেন নি। এ সম্বন্ধে একটা ঘটনা বলছি। বছর তিনেক আগে আমার একটি বিদেশী ভদ্রমহিলা ও তাঁর স্বামীর সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল। তাঁরা তখন সদ্য শান্তিনিকেতন থেকে ফিরে গিয়েছেন। গুরুদেব সম্বন্ধে তাঁদের গভীর ভক্তি ও জানবার আগ্রহ। তাঁরা দুজনে শান্তিনিকেতন ও শ্রীনিকেতনের ব্যবস্থায় মুগ্ধ, অজস্র প্রশংসা করলেন—খুব সুন্দর জায়গা সুন্দর ব্যবস্থা শ্রীনিকেতনে কত ভাল ভাল জিনিষ তৈরী হয়, Tagore কি কর্মদক্ষ ব্যক্তিও ছিলেন, কিন্তু ইদানীং তিনি একটু অপ্রকৃতিস্থ হয়ে পড়েছিলেন এ বড় দুঃখের কথা। আমি তো স্তম্ভিত, বল্লুম, "সেকি! আমি তো যতদূর জানি শেষ পর্য্যন্ত তাঁর প্রতিভাও ছিল অম্লান। মৃত্যুর আগের দিন যে কবিতা তিনি লিখেছেন জগতে তার তুলনা মিলবে না। অপ্রকৃতিস্থ হলেন কবে?"

তারা বল্লে, "তা তো জানিনে। এক ব্যক্তি সেখানে আমাদের সব ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখালে—তার কথাতে সেই রকম বুঝলুম। সে বল্লে এই যে সব বাড়ি দেখছেন—এ সব তাঁর খেয়ালে তৈরী। স্থির হয়ে থাকতে পারতেন না, বারবার মত বদল হত। এই বল্লেন এখানে থাকব—ছদিন বাদেই বল্লেন অন্যত্র যাব—খরচ পত্র করে একটি বাড়ি তৈরী হল, ছদিন বাদে বল্লেন—এ হবে না অন্য রকম একটা চাই। একটা মাটির ঘর বানালেন—সেটা আবার কেবল ভেঙ্গে যায়" ইত্যাদি। আমি আপনাদের বোঝাতে পারব না আমার সেদিন কি রকম মনে হয়েছিল তাঁর চলমান অনুভূতিশীল কবি মনের এই কেরিকেচর শুনে। আমি তাঁদের বল্লুম, ঐ ব্যক্তির দুর্ভাগ্য যে তিনি অনেক দিন শান্তিনিকেতনে থাকা সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়নি—তিনি দেখতে পাননি তাঁর জ্যোতির্ময় স্বরূপ, এ বর্ণনা আওরঙ্গজেব-টেব কোনও বাদশার হবে, রবীন্দ্রনাথের নয়। কেন যে তিনি ছোট বাড়িতে থাকতে চাইতেন, কেনই বা তাঁর মাটির কুঁড়ের উপর লোভ, কেনই বা তাঁর শিল্পীমন আবেষ্টনের পরিবর্তনে আন্দোলিত হত সে কথা আমাদের স্থূল বুদ্ধির অগোচর হলেও—তিনি কখনও রাজসিকতা করেন নি, নিজের ভোগে এতটুকু অপব্যয় করেন নি, জীবনের সর্বস্ব দান করেছেন আনন্দে যে আনন্দে বিকশিত এই বিরাট কর্ম প্রচেষ্টা। সেই বিশ্বকেন্দ্রিক জীবন আহ্বান করেছে সমস্ত মানুষকে নিজের নীড়ে, সে কথা বিশেষভাবে আমাদের উপলব্ধি করা চাই।

যে তিনি নূতনের প্রয়াসী জগৎ সংসারের চিরপুরাতনের ভিতর নূতনকে দেখেছেন—চিরপুরাতন সূর্য্যোদয় যাঁর চোখে প্রত্যহ নবীন হয়ে দেখা দিয়েছে, জড় প্রকৃতি, মানব সম্বন্ধ ও সমস্ত বিশ্ব ব্যাপার যাঁর দৃষ্টিতে নূতন নূতন তাৎপর্য্য লাভ করেছে, দীর্ঘ আশী বৎসর ধরে এই বিশ্বের সমস্ত রূপ রস যিনি নূতনভাবে গ্রহণ করলেন—মৃত্যুর মুখে দাঁড়িয়েও করলেন সৃষ্টি, সেই বেগবান গতিশীল মন জীবনের সমস্ত সংঘাত থেকে আনন্দলাভ ও আনন্দ উৎসারিত করে বয়ে চলেছিল। তাই অনায়াসে বলেছেন, "আনন্দ সর্বলোকে মৃত্যু বিরহে শোকে। আনন্দ সর্বকালে দুঃখে বিপদজালে"। আমাদের নিতান্ত সংক্ষিপ্ত মন নিয়ে দুএকটি ঘটনার আলোচনা করে সেই স্বর্গবিহারী মনের গতিবেগ ধারণ করতে পারব না। তিনি তাঁর নিজের জীবনকে যে কাব্যে প্রবাহিত করেছেন সেই কাব্যের পথে তাঁকে বুঝতে চেষ্টা করতে হবে তবেই তাঁর সংসারের কাজ আমরা ভাল করে বুঝতে পারব। এবং সেই বোঝাটা একান্ত প্রয়োজন, কারণ এই প্রতিষ্ঠান অন্য যে কোনও একটি কটেজ ইনডাস্ট্রি বা কর্ম-প্রতিষ্ঠানের মতন হলেই চলবে না—শুধু ভাল জিনিষ তৈরী করে সমাপ্ত হলে চলবে না—সমস্ত বাহ্যিক কর্মের ভিতর দিয়ে মানুষকে তিনি ফোটাতে চেয়েছিলেন সেই সত্যটি জানা চাই। তাঁর জীবনের বাণী যেন আমাদের মনে পৌঁছায়।

শুধু বাহিরের ঘটনাবলী সংগ্রহ করে ও তার কর্মের মাপ ও তালিকা মিলিয়ে আমাদের কাছে সে বাণী পৌঁছবে না। যে

তিনি সমস্ত বিশ্ব-প্রকৃতির মধ্যে মানুষের অন্তরাত্মার মধ্যে নিত্য মাধুরীর সন্ধান পেয়েছেন, ক্ষুদ্র মানুষের ভিতরে অতুল সম্ভাবনা যাঁর কাছে প্রত্যক্ষ হয়েছে বলেই মানুষের পূর্ণ বিকাশ ঘটিয়ে তোলবার সাধনাই যাঁর সারা জীবনের ব্রত হয়ে উঠেছে—তাঁর চিত্তশক্তির প্রভাব এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত সমস্ত নর-নারীর মনে ব্যক্ত ও অব্যক্ত ভাবে নিশ্চয় পড়েছে, কিন্তু তার সজ্ঞান উপলব্ধি চাই, তা সাধনা সাপেক্ষ !

শ্রীনিকেতনে উৎসবে পঠিত, ১৯৫০।

জাতীয় জীবনে

আজ আমরা সাহিত্য আলোচনার জন্য একত্র হয়েছি। কিন্তু আজ যাকে কেন্দ্র করে সমস্ত দেশের হৃদয় স্পন্দিত হচ্ছে তা আমাদের প্রত্যেকের মনে একটি বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছে—সে আমাদের নব জাগ্রত জাতীয় জীবন। তাই কবিগুরুকে আজ সেই দিক থেকে দেখবার চেষ্টা করেছি, এই প্রবন্ধে। আজকের যে তুমুল আলোড়ন ও যুগান্তকারী বিপ্লবের মাঝখানে আমাদের জাতীয় জীবন স্পন্দিত হচ্ছে তা আমাদের প্রত্যেকের মনে একটি বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছে। আবাল বৃদ্ধ বণিতা কেউই আজ কোনো ঘটনা বা চিন্তাকে বিচ্ছিন্নভাবে দেখে না দেখতে চায় না, যা কিছু ঘটুক সে সমস্ত ঘটনাকে একটা বৃহত্তর পরিস্থিতিতে যুক্তভাবে দেখে। আজ আমাদের নিজের অস্তিত্ব জাতীয় অস্তিত্বের মধ্যে তার অর্থ খুঁজছে, দেশের কী উপকারে লাগল, স্বাধীনতা সংগ্রামে কার কতটুকু দান তাই দিয়ে আজ আমাদের মনে মানুষের এবং তার কাজের মূল্য নির্ধারিত হচ্ছে। আজ কেউ কোনো বড় কাজ করলে, দার্শনিক কোনো নূতন মত উদ্ভাবিত করলে, বৈজ্ঞানিক

কোনো নূতন সত্য খুঁজে পেলে আমরা সেই সেই কাজকে শুধু কাজের মূল্যে দেখিনা আমাদের মনে স্বতই এবং প্রথমতই মনে হয় যে এই কাজের দ্বারা আমাদের দেশ বিশ্ব দরবারে তার আপন আসন প্রতিষ্ঠিত করছে। এবং বিপরীত পক্ষে যখন কোনো ক্ষুদ্রতা নীচতা দেখি, ক্ষুদ্র স্বার্থের বশবর্তী হয়ে নানা অন্যায় আচরিত হতে দেখি, তখন তাকে জাতীয় কলঙ্ক বলে আপনাকে ধিক্কার দিই। একটা সদা জাগ্রত সচেতন চিন্তাকে আমরা অহরহ লালন করছি, সদ্যপ্রসূত সন্তানের মত সে আমাদের বক্ষলগ্ন হয়ে আছে। যতদিন না এই আরব্ধ কর্ম সবল স্বপ্রতিষ্ঠ হ'য়ে আপন সার্থকতা লাভ করবে ততদিন তাকে ঘিরেই আমাদের প্রধান প্রয়াস ও চিন্তার আবর্তন চলবে।

এই বিরাট জাতীয় জাগরণে রবীন্দ্রনাথের কতখানি দান তা নিয়ে যথোপযুক্ত আলোচনা এখনও হয়নি তবু প্রত্যেক শিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রেই জানেন স্বদেশী যুগের সেই ঊষাকালে কেমন করে কী আশা নিয়ে তিনি কর্মজীবনে নেমেছিলেন। আজ যে সব চিন্তা যে সব কথা অনায়াসে জনসাধারণের বুদ্ধির এবং অনুভূতির গোচর হচ্ছে, পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব থেকে বৎসরের পর বৎসর, কত কথায়, গল্পে, গানে, কবিতায়, বক্তৃতায়, প্রবন্ধে সেই সব চিন্তা তিনি প্রচার করেছেন কুসংস্কারাচ্ছন্ন মোহগ্রস্ত অধীনতার পাপে নির্বাপিততেজ দেশবাসীর মধ্যে, যাতে মূঢ় বুদ্ধি পেয়েছে, মূক ভাষা পেয়েছে, ম্লান হৃদয় নূতন আশায় বুক বেঁধেছে, সে বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা প্রয়োজন। তাঁর যে চিন্তা যে

ধ্যানশক্তি আমাদের মধ্যে আমাদের অজ্ঞাতসারে প্রবেশ করে জাগিয়ে তুলেছে বহু সুপ্ত ক্ষমতা, লুপ্ত বীর্য, দূর করেছে জড়তা বুদ্ধির, আমাদের অগোচরে ধীরে ধীরে আমাদের আজকের বাঙ্গালী, আজকের ভারতীয় করে গ'ড়ে তুলেছে, বিস্তারিত আলোচনার দ্বারা সেই বৃহৎ সত্যকে উপলব্ধি এবং জনসাধারণের গোচরীভূত করা আমাদের জ্ঞানগুরুর প্রতি যথার্থ শ্রদ্ধা নিবেদন। এই সুদীর্ঘ ইতিহাস ভালোভাবে আলোচনা করতে হলে অনেক সময় ও সাধনা প্রয়োজন।

আজ আমরা সংক্ষেপে কয়েকটি ঘটনা এবং দুএকটি বিষয় মাত্র আলোচনা করব। তাঁর শেষ জীবনে, মনুষ্যত্বের প্রতি চির শ্রদ্ধাশীল তাঁর মনে মানুষের আজকের হিংস্ররূপ গভীর বেদনা দিয়েছিল। অবিশ্বাস প্রতারণা ও সর্বগ্রাসী স্বার্থপরতার উন্মাদ নৃত্য যখন জগৎজুড়ে চলেছে, তখন সেই চিরপ্রেমিক, বিশ্বমানবের সঙ্গে সখ্যে আবদ্ধ, অস্তগমনোন্মুখ বিরাট মানবাত্মাকে আমরা নিকট থেকে দেখবার সুযোগ পেয়েছিলাম।

রবীন্দ্রনাথ তো একটি মাত্র মানুষ ছিলেন না। তাঁর বিচিত্র সাহিত্য শুধু লেখনীর বৈচিত্র্য নয়, যে এক আপনাকে বহুর মধ্যে প্রকাশিত করেছেন, একজীবনে এক ব্যক্তিত্বে বিচিত্রকে গ্রথিত করে তিনিই এই মহামানবের মধ্যে আপনার প্রতিবিম্ব ফেলেছিলেন। এক রবীন্দ্রনাথ বিশ্বপ্রেমিক, সর্বমানবের সঙ্গে যুক্তভাবেই তাঁর অস্তিত্ব তাঁর আনন্দ ও তাঁর জীবনের পূর্ণ প্রকাশ। আর এক রবীন্দ্রনাথ দেশের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষায় জাতীয়তা

মন্ত্রে দীক্ষিত। দেশের ছোটবড়, ভালমন্দ ত্রুটি ও উন্নতির দিকে তাঁর সদাজাগ্রত দৃষ্টি। বস্তুত তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের সঙ্গে জাতীয় জীবন, এবং জাতীয় জীবনের সঙ্গে বিশ্ব জীবন ওতপ্রোত হয়ে মিশে গিয়েছিল।

একদিকে ভারতবর্ষের অতীত আদর্শ তাঁর উপলব্ধিতে নূতন রূপ নিয়েছে, এদেশের যা কিছু ভালো যা কিছু বিশেষত্ব যা কিছু মহৎ তা জগতের সামনে উদ্‌ঘাটিত করেছেন, তাকেই আপন জেনে তারই মধ্যে আশ্রয় খুঁজেছেন, তারই মঙ্গল সাধনে ভিক্ষাপাত্র হাতে নিয়েছেন। আর একদিকে অনেক ভেঙ্গেছেন, অনেক মূঢ় বুদ্ধি, অনেক সংস্কারের মূলে আঘাত করেছেন। যে জন্য এদেশের এক বিশিষ্ট সনাতনী এই সেদিনও তাঁর বাণীকে 'মামুদ গজনীর বাণী' বলে বিদ্রূপ করতে লজ্জিত হন নি।

মৃত্যুতে যে নবজীবনের সূচনা, ভাঙনের দ্বারা যে গড়নের সম্ভাবনা—শীতের পর যে বসন্তের যৌবনলীলা সে তত্ত্ব তিনি শুধু ছন্দোবন্ধে আবদ্ধ রাখেন নি, সমাজের মূলে তাকে আহ্বান করেছেন। আবার স্বতঃউৎসারিত তাঁর সৃজনী শক্তি কাজ করে চলেছে গড়ার। স্বাধীন কুসংস্কারমুক্ত চিন্তা দিয়ে, যুক্তি দিয়ে, আদর্শ দিয়ে মানুষের অগোচরে তার মনুষ্যত্বকে যথার্থ মহৎ ক'রে তোলার, গ'ড়ে তোলার সবল সচেতন ধ্যান শক্তি। বিচিত্র বিভিন্ন বহুমুখী পথ মত ও চিন্তার দ্বারা নিজেকে নানাভাবে প্রসারিত করে তিনি সেই এক চিরন্তন সত্যকে খুজতেন, যা ন্যায় যা কল্যাণধর্মী। অন্যায়ের বিরুদ্ধে অকল্যাণের বিরুদ্ধে সবলে

দাঁড়িয়ে তাকে গ্রহণ করতেন। সেজন্য যদিও আমাদের কবি স্বভাবত কবিদের যে রকম বর্ণনা হয়ে থাকে সে রকম খামখেয়ালী বা ভাবপ্রবণ ছিলেন না। বস্তুত গদগদ ভাবপ্রবণতা তার অসহ্যবোধ হত। সুচিন্তিত বিচক্ষণতায় তার মত ও কর্ম চালিত হত, তবুও অনেক সময় নিজেকে তাঁর খণ্ডন করতে হয়েছে। যে মুহূর্তে তিনি কোনো মত, কোনো পন্থা অসত্য বলে জেনেছেন পর মুহূর্তে তা মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করতে দ্বিধা হয়নি।

বিশ বৎসর পূর্বে নব জাগ্রত ইটালীতে যখন মুসোলিনী তাঁকে মহাসমারোহে নিয়ে গিয়েছিলেন তখনকার কথা অনেকেই জানেন আবার অনেকের হয়ত স্মরণ নেই। কবির কাছে সেই বিপুল সমারোহের গল্প শুনেছি। রাজকীয় সে সম্বর্দ্ধনা। আদর যত্ন কোনো অধীন দেশের কবির যেমন হতে পারে তেমন নয়, সম্রাটের সম্মানে তাঁকে সম্বর্দ্ধিত করা হয়েছিল। কবি তাদের নব জাগ্রত জাতীয় চেতনা, নানা সংগঠনমূলক কাজ এবং নানা প্রগতি প্রয়াস দেখে খুবই সন্তুষ্ট ও মুগ্ধ হয়েছেন। কিন্তু তখন তিনি জানতেই পারেন নি যে একপক্ষের ছবিই মাত্র তাঁকে দেখান হয়েছে। ফ্যাসিষ্ট বিরোধীদের ঠেকিয়ে রাখা হয়েছে। ক্রোচে প্রভৃতি বিখ্যাত মনীষী, যাঁরা মুসোলিনীর বিরুদ্ধ পক্ষ তাঁদের সরিয়ে রাখা হয়েছে দূরে। চতুর্দিকে নিজেদের একটি ব্যূহ রচনা করে তাঁকে ঘিরে রাখবার চেষ্টা চলেছিল। তাঁর বক্তৃতা ইটালীয়ানে নিজেদের সুবিধামত ভাবে মোড় ফিরিয়ে অনুবাদ করে প্রচারিত করেছে। ইটালী থেকে বেরিয়ে

সুইটসারল্যাণ্ডে এসে রোঁমারোঁলা প্রভৃতির কাছে যখন যথাযথ ব্যাপার, ব্যক্তি স্বাধীনতার প্রতি নানা অত্যাচারের খবর জানতে পারলেন তখন সমস্ত আদর আপ্যায়ন, রাজপুরুষের স্বার্থান্বেষী প্রীতির প্রতি তাঁর মন বিষিয়ে উঠল এক মুহূর্তে। তৎক্ষণাৎ কাগজে খোলা চিঠি লিখলেন তাতে গভীর ধিক্কারের সঙ্গে প্রতিবাদ করলেন। 'ডুচে'র বলবার কিছু ছিল না, কিন্তু ডিক্টেটরের নিরুপায় রোষ যেভাবে প্রকাশ করা যায় তা করলেন। একটি কাগজে তাঁকে বিশ্রীভাবে গালাগালির ব্যবস্থা হল। তবে ইটালীতে বোধ হয় কবির বক্তব্য কেউ জানতে পারল না। এদেশেও অনেকেই বলেছেন মুসোলিনীর সঙ্গে ঝগড়া করাটা ঠিক হয় নি। অত আদর যত্ন! তদুপরি একজন ডিক্টেটর, লাভ কি শুধু শুধু চটিয়ে দিয়ে? এ প্রতিবাদের দ্বারা ফল তো কিছু হবেনা। ফ্যাসিষ্ট অত্যাচার বন্ধ হবে না। সে ক্ষেত্রে এরকম একজন শক্তিশালী লোককে শত্রু করে লাভ কি? বিশেষত তারা যখন অত সমারোহ করে সম্বর্দ্ধনা করেছে ভবিষ্যতেও করবে এমন যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। কিন্তু সেই তাঁর বিশেষত্ব—সত্যকে জানা মাত্র স্বীকার করবেন। কোনো প্রয়োজনের অনুরোধে এড়িয়ে যেতে পারতেন না। তিনি যে বিশ্বাস করতেন, "তোমার ন্যায়ের দণ্ড প্রত্যেকের করে অর্পণ করেছ নিজে।" বিশ্বাস করতেন 'অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে' উভয়েই সমান অপরাধী। তাই চিরন্তন বিশ্ববিধানে যা অধর্ম যা অন্যায় তাকে অন্যায় বলতে তাঁর একটুও দেরী সইত

না। ভেবেচিন্তে সুবিধে সুযোগ বুঝে কাজ করা এবিষয়ে চলত না।

গল্প শুনেছি এই ঘটনা ঘটবার কিছু পরে, এদেশে একজন ইটালীয়ান ভদ্রলোক একাকী গোপনে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চান, এবং একটি উপহার দিয়ে বলেন আমার দেশ তোমার প্রতি যে অবিচার করেছে তারই প্রতিবাদ স্বরূপ আমি তোমায় শ্রদ্ধা জানাতে এসেছি।

আজ যখন সমস্ত জগতের মধ্যে অবিচার, শঠতা ও অসত্যের প্রবল প্রতাপ চলেছে, যখন স্বার্থকে ধর্ম বলে, লুব্ধতাকে মঙ্গল বলে, ডাকাতের সর্বগ্রাসী আক্রমণকে শান্তির দূত বলে ঘোষণা চলেছে, পৃথিবীর সর্বত্র ন্যায় ধর্ম দলিত হচ্ছে, সবল যখন দুর্বলকে রক্ষা করে না, জয়ী যখন পরাজিতকে অসম্মান করে, বিচার যখন চাতুরী খোঁজে, কৌশল যখন সত্যের চেয়ে বড় হয়ে দাঁড়িয়েছে, তখন আমরা বুঝতে পারি, জগতে কোথাও নির্ভীক সত্য উচ্চারিত হলে মানুষ কতখানি শক্তি বীর্য্য ও বিশ্বাস লাভ করতে পারে।

কি দেশে, কি বিদেশে, কোনো সঙ্কোচ ভয় বা বাধা তাঁকে বিরত করতে পারেনি। যে সুগভীর অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে তিনি মানুষের জীবনকে দেখতেন আপাত মনোহারিত্বের সমস্ত কুয়াসা ভেদ করে তাতে সত্য উদ্ভাসিত হয়ে উঠত। গত যুদ্ধ সুরু হবার পূর্ব থেকে উপকরণলোলুপ বস্তু তান্ত্রিকতা আর অন্ধ জাতীয়তাবাদের অবশ্যম্ভাবী পরিণামের কথা বলেছেন, মানুষকে অন্তর্মুখী হতে বলেছেন। অবশ্য কেউ তাঁর কথায় কর্ণপাত

করেনি। ভুল বুঝেছে। কিন্তু তিনি বিরত হননি। জাপানে গিয়ে জাপান সরকারের বিরাগভাজন হয়েও পাশ্চাত্য বস্তু-তান্ত্রিকতার অনুকরণ ও জাতীয়তাবাদের নিন্দা করেছেন—ধর্মের পথ নির্দেশ করেছেন। তাঁর ধ্যান শক্তির ভিতর প্রাচীন 'প্রাচী'র রূপ তাদের দেখিয়েছেন। ১৯১৬ সালে যুদ্ধের মধ্যেও অ্যামেরিকাতেও তিনি বিশ্বমৈত্রীর বাণী বহন করে নিয়ে যেতে ইতস্তত করেন নি। যুদ্ধের মধ্যে তখন সমস্ত দেশের মন জাতীয়তাবাদের মদ্য পান করে মত্ত হয়েছে, জাতিতে জাতিতে আত্মঘাতী যুদ্ধ চলেছে, তখনও সেই রণোন্মত্ত পাশ্চাত্য জাতির অহঙ্কৃত বিরোধিতার সামনে দাঁড়িয়ে তিনি বার বার তাঁদের ভুল স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। তারা অনেকেই সুখী হয় নি, অনেকেই তাঁর বাণী যুবকদের পক্ষে মানসিক বিষ মনে করেছে। যুদ্ধ-বিরোধী আধুনিকতার পরিপন্থী অলস কল্পনা বিশ্বাস বলে মনে করেছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও দেশ থেকে দেশে সহর থেকে সহরে তিনি সেই বিস্মৃত মানব প্রেমের কথা স্মরণ করিয়ে ন্যাশনালিজম্ দানবের কাছে নরবলি দিতে বারণ করেছেন। সত্য দৃষ্টির অসীম শক্তিই তাঁকে সমস্ত প্রতিকূলতার মধ্যে অসমসাহসিক দৃঢ়তা দান করেছে। এবং যদিচ বিরোধিতা এমন কি বিদ্রূপ তাঁকে সহ্য করতে হয়েছে—তা সত্ত্বেও বহুলোকের মনে তাঁর বাণী গভীরভাবে আঘাত না করে পারে নি। মানুষকে মনে পড়িয়েছে মনুষ্যত্বের যথার্থ কী দাবী! যুদ্ধের সময় যুদ্ধরত সৈনিকদের ট্রেঞ্চে ট্রেঞ্চে তাঁর ন্যাশনালিজম্ বই এর প্রতিলিপি

হাতে হাতে ঘুরেছে। অনেক যুবক যুদ্ধ ছেড়েছে। একজন ইংরেজ যুবক কোর্ট মার্শালের শাস্তি গ্রহণ করেও যুদ্ধ ত্যাগ করেন, তিনি লিখেছিলেন :—

What to do when the personal application of such words came home to me I did not know, but what not to do was plain as a pikestaff, and in the moment of that recognition I had ceased from organised war forever.

(রবীন্দ্র জীবনী—প্রভাতকুমার)

তাঁর শান্ত উদাত্ত নির্ভীক অথচ সর্বপ্রকার ছদ্মতাশূন্য সত্যবাণীতে দেশেবিদেশে জাগ্রত হয়ে উঠত সেই আশ্বাস। মানুষের মনে পড়ত—অন্যায় ও মিথ্যার আড়ালে ঢাকা পড়লেও মানুষ তার চাইতে বড়। সাময়িক প্রয়োজনের বশীভূত হয়ে মানুষ যা কিছু প্রচার করে, স্বার্থের জন্য দেশে দেশে যে সমস্ত নীতি ও মত তৈরী হয়, তার অতীত এবং তার উর্দ্ধে কোনো বৃহত্তর সত্য আছে। উত্তেজনার বশীভূত হয়ে আমরা একথা অনেক সময়ে ভুলে যাই যে, যে বিশ্ববিধান মানুষের অন্তরের মধ্যে থেকে সত্যকে ন্যায়কে তার যথার্থতা বুঝতে চিনতে শেখায়, সাময়িক প্রয়োজনের খাতিরে, তা সে প্রয়োজন যত গুরুতর হোক, তাকে অগ্রাহ্য করা মনুষ্যত্বের ত্রুটি। এই জন্যই চলতি মত, চলতি উত্তেজনার সঙ্গে তিনি আবেগের বশে সুর মেলাতে পারতেন না। নিজের দেশেও তাই বাধত বিরোধ। তখন

মুখর নিন্দার ঘূর্ণি বায়ু বইত। মতের বিরুদ্ধতা তিনি, যেমন ব্যক্তিগত জীবনে তেমনি সামাজিক জীবনে, আনন্দে বহন করতেন কিন্তু ক্ষুদ্রতা তাঁকে পীড়া দিত—তাঁর পেলব স্পর্শকাতর মন সংকুচিত হয়ে আসত। শেষজীবনে অতীতের দিকে দৃষ্টিপাত করে প্রায়ই বলতেন প্রথম স্বদেশী যুগের কথা—

"......আমাদের বাড়িতেই প্রবল হাওয়া বয়েছিল। যাকে তোমরা এখন বল দেশাত্মবোধ, তা তখন দেশের মধ্যে একেবারেই জাগেনি। বিলিতী ষ্টীমারে এক পয়সা সস্তা হলে লোকে তাতেই চড়বে। তবু লোকসানের পর লোকসান দিয়ে জ্যোতিদাদার নানা চেষ্টা চলেছিল। লাভ হোক বা না হোক প্রথম এসেছিল ভাব।" যে ভাব আজ সমস্ত দেশের মধ্যে প্রবল প্রাণ শক্তিতে স্পন্দিত হচ্ছে সেদিন তার প্রথম সূচনাই হয়েছিল তাঁদের মধ্যে। চরকা আন্দোলনের বহু পূর্বেই তিনি লিখেছিলেন—

"নিজ হস্তে পাক অন্ন তুলে দাও পাতে,
তাই যেন রুচে।
মোটা বস্ত্র বুনে দাও যদি নিজ হাতে,
তাতে লজ্জা ঘুচে।"

স্বদেশী ভাণ্ডার স্থাপন করে স্বদেশী জিনিষ চালাবার চেষ্টা প্রথম তাঁরাই সুরু করেন। কিন্তু তারপর যখন বিদেশী বর্জনের ধুয়োতে ক্রমে ক্রমে দেশের মধ্যে একটা প্রচণ্ড সেন্টিমেণ্ট্যাল মাতলামি সুরু হয়ে গেল—তখন তিনি কিছুতেই তার সঙ্গে

যোগ দিতে পারলেন না। তখন তিনি স্পষ্টই বলেছিলেন যে এই ভাঙ্গনের মত্ততার মধ্যে গড়বার শক্তিকে সঞ্চয় করা চাই। তা না হলে এ শুধু অপব্যয়, এ শুধু ক্ষতি। কিন্তু তখন সে কথা কারু পছন্দ হলনা। গদগদ সেন্টিমেণ্ট্যাল বক্তৃতা দিতেন নেতারা। "মাটি তো নয় মা'টি। কি কাজ করতে হবে তার কোনো নির্দেশ নেই প্ল্যান নেই। কেবল চীৎকার। অনেক অন্যায় অবিচার স্বার্থপরতা দেশহিতের নাম করে চলেছিল। যে সব টাকা উঠতে লাগল দেশের কাজের নাম করে সে কোথায় অন্তর্হিত হতে লাগল কেউ জানেনা। তখন আমি দেখলুম এ আমার দ্বারা চলবে না।"......

তিনি আরও দেখলেন উত্তেজনায় মত্ত হয়ে কেবল হৃদয়াবেগকে সম্বল করে ছুটোছুটি করে কোনো যথার্থ মঙ্গল ঘটিয়ে তোলা যায় না। জ্ঞানের শান্তি, অধ্যবসায় ও সবল একাগ্র কর্মনিষ্ঠা দিয়ে দেশের ভিতরের শক্তিকে জাগিয়ে না তুলতে পারলে সমস্ত বড় বড় কথাকে কাজের মধ্যে সার্থক না করতে পারলে এই বিপ্লবের উত্তেজনা ব্যর্থ। কিন্তু তখন বড় বড় মিটিং করে উত্তেজক কথা বলাই দেশের প্রধান কাজ হয়েছিল। নিরীহ লোকের উপর অত্যাচার। গরীব চুড়িওলার টুক্‌রী গু঳ড়িয়ে, কাপড়ওলার পুঁটলীটাতে আগুন ধরিয়ে উত্তেজনার ফেনিল মত্ততা, বন্দেমাতরম্ ধ্বনিতে চলল অত্যাচারকে মহিমান্বিত করবার চেষ্টা। তখন তিনি বুঝলেন এ কাজ সমর্থন করা তাঁর দ্বারা চলবে না। তাই "পেয়েছি ছুটি বিদায় দেহ ভাই,

সবারে আমি প্রণাম করে যাই” বলে বিদায় নিলেন পলিটিক্সের পঙ্কিল আবহাওয়া থেকে, রাজনৈতিক উত্তেজনার ক্ষেত্র থেকে। কারণ কোনও স্থায়ী এবং যথার্থ হিত ঘটিয়ে তুলতে হলে তপস্যা চাই। সে তপস্যা এই হট্টগোলের মাঝখানে চলতে পারে না। তখন সমস্ত বাহ্যিক আড়ম্বর থেকে বিদায় নিয়ে, জীবনের শক্তি সামর্থ্য ও সাধনা দিয়ে সেই গড়ার কাজে নিযুক্ত হলেন—শুধু চিন্তা দিয়ে বুদ্ধি দিয়ে প্রেরণা দিয়ে নয়, হাতে কলমে কাজে। যা জগতের ইতিহাসে খুব কম কবির জীবনেই ঘটেছে। যিনি লিখেছেন, “এই সব মূঢ় ম্লান মূক মুখে দিতে হবে ভাষা” তিনি যে যথার্থই ভাষা দেবার জন্য বিদ্যালয় করে সমস্ত জীবনের উপার্জন ও শক্তি সমর্পণ করলেন এ জগতে খুব কম কবির জীবনেই দেখা যায়, বোধহয় একজনও নয়।

সেই সময় প্রায় চল্লিশ বিয়াল্লিশ বৎসর পূর্বে, দেশের সাময়িক মতবাদকে অগ্রাহ্য করে বিপ্লবের আত্মঘাতী অভিমানকে ক্ষুব্ধ করে বলেছেন—“সকল দেশের ইতিহাসেই, কোনো বৃহৎ ঘটনা যখন মূর্তি গ্রহণ করিয়া দেখা দেয়, তখন তার অব্যবহিত পূর্বেই আমরা একটা প্রবল আঘাত ও আন্দোলন দেখিতে পাই, রাষ্ট্রে বা সমাজে অসামঞ্জস্যর বোঝা অনেকদিন হইতে নিঃশব্দে পুঞ্জীভূত হইতে হইতে একদিন একটা আঘাতে হঠাৎ বিপ্লবে ভাঙ্গিয়া পড়ে। সেই সময়ে দেশের মধ্যে যদি অনুকূল উপকরণ প্রস্তুত থাকে, পূর্ব হইতেই যদি তাহার ভাণ্ডারে নিগূঢ়ভাবে জ্ঞান ও শক্তির সম্বল সঞ্চিত থাকে তবেই সেই বিপ্লবের দারুণ আঘাতকে

কাটাইয়া সে দেশ আপনার নূতন জীবনকে নবীন সামঞ্জস্য দান করিয়া গড়িয়া তুলিতে পারে।......

......শুদ্ধমাত্র ভাঙন নির্বিচার বিপ্লব কোনোমতেই কল্যাণকর হইতে পারে না।" জনতার মনোরঞ্জনের চেষ্টা মাত্র না ক'রে, মুমূর্ষুর ইচ্ছার বিরুদ্ধে হিতাকাঙ্ক্ষী চিকিৎসকের ঔষধের মতন তিনি এসব কথা বলেছিলেন। যে শক্তি ধৈর্য্য ও যে সমস্ত ক্ষুদ্র স্বার্থের বন্ধন মোচনের দ্বারা, উদ্যমের দ্বারা, যথার্থ হিত সাধন সম্ভব হয়, দেশপ্রেমের আবেগকে প্রতিদিনের অক্লান্ত অধ্যবসায়ের দ্বারা নানা বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করে প্রতিদিবসের কর্মে প্রতিদিন নিরলস থেকে, যে কর্ম করতে হয় সেই তপস্যার পথকেই তিনি মঙ্গলের পথ বলে নির্দেশ করেছিলেন। বলেছিলেন, "ক্রোধের আবেগ তপস্যাকে বিশ্বাসই করে না, তাহাকে নিশ্চেষ্টতা বলিয়া মনে করে। তাকে নিজের আশু উদ্দেশ্য সিদ্ধির অন্তরায় বলিয়া ঘৃণা করে।......কিন্তু স্ফুলিঙ্গের সঙ্গে শিখার যে প্রভেদ, উত্তেজনার সহিত শক্তির সেই প্রভেদ। চকমকি ঠুকিয়া যে স্ফুলিঙ্গ বাহির হইতে থাকে তাহাতে ঘরের অন্ধকার দূর হয়না। তাহার আয়োজন স্বল্প তেমনি তাহার প্রয়োজনও সামান্য। যখন যথাযথ মূল্য দিয়া সমস্ত কেনা হইয়াছে এবং পরিশ্রম করিয়া সমস্ত প্রস্তুত হইয়াছে তখনই স্ফুলিঙ্গ প্রদীপের মুখে আপনাকে স্থায়ী শিখায় পরিণত করিয়া ঘরকে আলোকিত করিতে পারে।"

একদিকে চিরসাধক অক্লান্তকর্মী রবীন্দ্রনাথ কর্ম সাধনার

সত্যকে এইভাবে নিজের জীবনে পূর্ণ করেছেন, প্রদীপের আয়োজনে তাঁর আশী বছরের সুদীর্ঘ জীবনের একটি মুহূর্তও অলসতায় নষ্ট হতে পারে নি। অতি প্রত্যুষে নিদ্রোত্থিত হয়ে তিনি কাজে নিযুক্ত হতেন, তারপর সারাদিনব্যাপী তাঁর কর্মযজ্ঞ অনায়াস আনন্দে এমনভাবে চলত যেন তার দায় নেই, ভার নেই। আপন আনন্দে প্রবাহিত মহাবেগবতী নদীর মত সেই স্বতঃ উৎসারিত কর্মপ্রবাহ আমাদের দেশকে নানা দিক থেকে উর্বর করেছে। নিজের কর্মক্ষেত্রে অবিচল থেকে, সকল দেশের সকল মানবের পক্ষে কর্মের সাধনার সংগঠনের চিরন্তন মূল্যকে বারবার নির্দেশ করেছেন। আর একদিকে আর এক বিদ্রোহী রবীন্দ্রনাথের মনে বিপ্লবের অগ্নিশিখা অন্যায়ের বিরুদ্ধে অপমানের বিরুদ্ধে বারবার জ্বলে উঠেছে। তখন তিনি মুক্ত কণ্ঠে বলেছেন—"শাসনে যতই ঘেরো, আছে বল দুর্বলেরো, আমাদের সহায় ভগবান"। দুর্বলের সেই বল শুধু আধ্যাত্মিক শক্তি নয়। অহিংস সত্যাগ্রহ তো নয়ই, তখন মুষ্টিযোগেও কবির আপত্তি দেখা যায় না।

সেই সময়ে চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ বৎসর পূর্বে কোনো একটি ঘটনা অবলম্বন করে তিনি লিখেছিলেন—"একথা কিছুতেই আমাদের বিস্মৃত হওয়া উচিত নয় যে, আইনের সাহায্যে সম্মান পাওয়া যায় না। সম্মান আমাদের নিজেদের হস্তে—উদাহরণ স্থলে আমরা খুলনার ম্যাজিষ্ট্রেট কর্তৃক মুহুরীমারার ঘটনার উল্লেখ করিতে পারি। ফরিয়াদী পক্ষের বাঙ্গালী ব্যারিস্টার

মহাশয় এই মদদ্দমার প্রসঙ্গে বারবার বলিয়াছেন মুহুরী মারার কাজটা ইংরাজের অযোগ্য হইয়াছে কারণ বেলসাহেবের জানা উচিত ছিল যে মুহুরী তাহাকে ফিরিয়া মারিতে পারে না। একথা যদি সত্য হয় তবে লজ্জার বিষয় মুহুরীর এবং তাহার স্বজাতিবর্গের। কারণ হঠাৎ রাগিয়া মারিয়া বসা পুরুষের দুর্বলতা কিন্তু মার খাইয়া বিনা প্রতিবাদে ক্রন্দন করা কাপুরুষের দুর্বলতা।···যথেষ্ট অপমানিত হইলেও একজন মুহুরী কোনো ইংরাজকে ফিরিয়া মারিতে পারেনা এই কথাটি ধ্রুব সত্যরূপে অম্লান মুখে স্বীকার করা আমাদের বিবেচনায় অত্যন্ত লজ্জাজনক আচরণ।"

একবার তিনি কথাপ্রসঙ্গে বলেছিলেন, "জালিওনলাবাগে স্মৃতিস্তম্ভ করবে বলে চাঁদা চাইতে এসেছিল, আমি ফিরিয়ে দিয়েছিলুম। লজ্জা! লজ্জা! অপমানের আবার স্মৃতিস্তম্ভ? দুর্বলতার আবার জয়ধ্বনি? মার খেয়ে যে মার ফিরিয়ে দিতে পারিনি চিরকাল কি সেই লজ্জার স্মৃতি রক্ষা করতে হবে?" তাই বলছিলুম যদিও তিনি অন্যায়ের দ্বারা অবৈধ উপায়ের দ্বারা কার্য্যোদ্ধারের নীতি কখনো সমর্থন করেননি, যখনই কোনো নিরপরাধ ইংরাজ নিহত বা প্রহৃত হয়েছে তখনই তিনি তার তীব্র প্রতিবাদ করে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে—"অধ্যবসায়ই শক্তি এবং অধৈর্য্যই দুর্বলতা। প্রশস্ত ধর্মের পথে চলাই নিজের শক্তির প্রতি সম্মান এবং উৎপাতের সঙ্কীর্ণ পথ সন্ধান করাই কাপুরুষতা। তাহাই মানবের প্রকৃত শক্তির প্রতি অশ্রদ্ধা

মনুষ্য ধর্মের প্রতি অবিশ্বাস।" কিন্তু তাই বলে অন্যায় অবিচার সহ্য করে যাওয়া তিনি সমর্থন করেন নি। এবং এ ছাড়াও মত পথের পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও এবং উদ্দেশ্য ও উপায়ের সুসঙ্গতি না থাকলেও যখনই কোনো মত বা সত্য অনুভূতি বিপুল বেদনায় বন্ধন রজ্জু ছিন্ন করবার জন্য বা অপমানের প্রতিকারের জন্য ব্যর্থ প্রচেষ্টায় নিঃশেষ হয়েছে তখনও তিনি ফলাফল বিচার করে তার মূল্য নির্দ্ধারণ সমাপ্ত করতে পারেন নি। প্রদীপের আয়োজনকে বৃহত্তর মঙ্গল বলে জানলেও স্ফুলিঙ্গের গৌরবও তাঁর মনকে তখন টেনেছে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিদ্রোহের আয়োজনে কোনো স্থায়ী উপকার হবে কিনা, কোন পথ যথার্থ পথ, কোন ধর্ম, কোন কর্তব্য আমাদের উপযোগী, জ্ঞানী মনীষী রবীন্দ্রনাথ যখন এ বিষয়ে চিন্তা করেছেন তখনও তিনি স্ফুলিঙ্গের আগুনের মতই ক্ষণস্থায়ী হলেও যে সত্য যে নির্ভীক তেজ নানা ব্যর্থ প্রচেষ্টায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে তার প্রতি বিরূপ হতে পারেননি। এই সব মর্মান্তিক পরম দুঃখকর অধ্যবসায় যা নানা অসম্ভব প্রত্যাশায় অসাধ্যসাধনে পরাভবের বহ্নিশিখায় ঝাঁপ দিয়েছে তাকে কি তিনি উপেক্ষা করতে পারেন? বাংলাদেশে যখন ইতস্তত বিচ্ছিন্ন ছোটছোট বিদ্রোহের মধ্যে এক একটি আত্মত্যাগী প্রাণ মুহূর্তের জন্য অসীম শক্তিতে জ্বলে উঠে অন্যায়ের বিরুদ্ধে অত্যাচারের বিরুদ্ধে তাদের ক্ষণকালীন অভিযান সমাপ্ত করেছে তখন স্থায়ী ফলাফল হোক বা না হোক এবং উদ্দেশ্য ও উপায় সম্বন্ধে মতের ভিন্নতা যত প্রবলই হোক সেই মর্মান্তিক প্রচেষ্টাকে

তিনি অনুভবের বেদনায় মূল্য দিয়েছেন। পথের অমিল কতটুকু আছে বা না আছে তা ভেবে কোনো বিরূপতা পোষণ করেন নি। তখন করুণার্দ্র ব্যথিতচিত্ত প্রেমতীর্থের চিরপথিকের বাণী স্তব্ধ হয়েছে বাঁশী সঙ্গীত হারিয়েছে।

আমি যে দেখেছি প্রতিকারহীন শক্তের অপরাধে
বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কাঁদে।
আমি যে দেখিনু তরুণ বালক উন্মাদ হয়ে ছুটে
কী যন্ত্রণায় মরেছে পাথরে নিস্ফল মাথা কুটে।
কণ্ঠ আমার রুদ্ধ আজিকে বাঁশী সঙ্গীত হারা—
অমাবস্যার কারা
রুদ্ধ করেছে আমার ভুবন
দুঃস্বপনের তলে·····

সেই দেখা যে শুধু দরদে করুণায় দেখা তা নয়। এই সমস্ত খণ্ড খণ্ড প্রকাশের ভিতর দিয়ে যে অখণ্ড মর্মভেদিনী বেদনা দেশের মর্মে সঞ্চারিত হচ্ছে তাঁর অন্তরে তা অখণ্ডরূপে অবিচ্ছিন্ন-রূপেই অনুভূত হয়েছে। তাই যে উদ্যম সফল হয়েছে তাকেও যেমন আবার যে রুদ্ধ আবেগ নিশ্চিত নিষ্ফলতার মধ্যেও নানা প্রয়াসে মুহুর্মুহুঃ স্পন্দিত হচ্ছে, তার মধ্যে হিংসা বুদ্ধি থাকলেও সেই সচেষ্ট আত্মত্যাগী উদ্যমকে বারংবার নমস্কারে অভিনন্দিত করেছেন।

এই বিভিন্নতার কথা আমি এজন্য বলছিনা যে রবীন্দ্রনাথ বারবার পথ পরিবর্তন করতেন বা মত পরিবর্তন করতেন।

আমার বক্তব্য এই যে কোনো পলিশি বা মতকে একেবারে সর্বতোভাবে সত্য বলে মেনে নিয়ে তিনি কখনো অচলায়তন গড়তেন না। হিংসাত্মক প্রবলতাতেই হোক বা সবল অহিংসার দৃঢ়তাতেই হোক যখনই কোনো সত্য বিশ্বাস ও অকপট প্রচেষ্টা দেখেছেন কবি তাকে স্বীকার করেছেন। প্রত্যেক পথে যতটুকু সত্য যতটুকু ন্যায় আছে, ত্যাগ আছে, মানব ধর্মের মহত্ব আছে সেটুকু তিনি সম্পূর্ণরূপেই গ্রহণ করেছেন। যেহেতু বিপ্লবাত্মক উপায়ে আমার বিশ্বাস সে হেতু তার মধ্যে অন্যায় আসুক অত্যাচার আসুক, অধর্ম আসুক উদ্দেশ্য সিদ্ধ হলেই হলো, এও যেমন নয়, তেমনি যে হেতু মানব মৈত্রীতে বিশ্বাস করি, অহিংসাকে পরম ধর্ম বলে মানি, তবু অটল দৃঢ়তায় উদ্দীপিত আত্মত্যাগের মহিমায় উজ্জ্বল সেই তাদের সর্বস্বার্থত্যাগী প্রচেষ্টা তিনি কি করে অবহেলা করবেন? সে চেষ্টাকে সফলতার মূল্যেই শুধু বিচার করা তাঁর জন্য নয়। তিনি যে কবি, প্রত্যেক মানুষের মনে যতটুকু সত্য, যতটুকু ন্যায়, যতটুকু ত্যাগ চকমক করে উঠছে তার প্রতিটি শিখার প্রতি জয়ধ্বনি ক'রে, আপাত দৃষ্টিতে শতধা বিচ্ছিন্ন, খণ্ড খণ্ড সত্যের মধ্যে সেই চির অখণ্ডকে—মানবধর্মের মহিমাকে—খুঁজে পাওয়াই তাঁর কবি চিত্তের ধর্ম।

মানুষের অপমান দুর্বিসহ দুখে
উঠেছে পুঞ্জিত হয়ে চোখের সম্মুখে—
ছুটিনি করিতে প্রতিকার
চিরলগ্ন আছে প্রাণে ধিক্কার তাহার।

অপূর্ণ শক্তির এই বিকৃতির সহস্র লক্ষণ—
দেখিয়াছি চারিদিকে সারাক্ষণ
চিরন্তন মানবের মহিমারে তবু
উপহাস করি নাই কভু।"

কি জাতীয় জীবনে, কি ব্যক্তিগত জীবনে কখনো কোনও একটি বিশেষ মতবাদের বশবর্তী হয়ে মানুষকে তিনি বিচার করতেন না। তাই কারু উপর নিজের মতামতের ইচ্ছা অনিচ্ছার বোঝা চাপাতেন না। সাময়িক বা প্রচলিত মতামতের প্রভাব থেকে যেমন তাঁর নিজের মন ছিল স্বাধীন, তেমনি অন্যকে স্বাধীনতা দেওয়াও তাঁর পক্ষে স্বাভাবিক ছিল। কাউকে জোর করে বলতেন না যে এইটে কর। "সবলে কারেও ধরিনে বাসনা-মুঠিতে, দিয়েছি সবারে আপন বৃন্তে ফুটিতে।" এই লাইন দুটি ভারি সত্য ছিল তাঁর জীবনে। প্রতি মানুষকে তার নিজের মতে, নিজের বিশ্বাসে, নিজের রূপেই দেখতে তিনি প্রস্তুত ছিলেন কারণ মানুষের মহত্ত্বে তাঁর বিশ্বাস ছিল। সব কুৎসিত প্রকাশের অন্তরালে চির সুন্দরকে, সব অপূর্ণতা ত্রুটি বিচ্যুতির মধ্যে পূর্ণকে, ক্ষুদ্রতার আচ্ছাদনের নীচে মহৎকেই তিনি দেখতে পেয়েছেন।

বেসুর ছাপায়ে কে দিয়েছে সুর আনি—
পরুষ কলুষ ঝঞ্ঝায় শুনি তবু
চির দিবসের শান্ত শিবের বাণী।

কিন্তু কোথায় প্রেম! কোথায় মহত্ত্ব! প্রবলের অত্যাচার আর 'বঞ্চিতের নিত্য চিত্ত ক্ষোভের' আলোড়নে যখন সমস্ত পৃথিবী আলোড়িত হয়ে উঠল তখন দেখেছি তাঁর বেদনা। সত্য জাগ্রত যে জাপানের সৃজনী তপস্যা দেখে একদিন তিনি 'ধ্যানী জাপান' বলে অভিনন্দন করেছিলেন সেই জাপান যখন চীনের কণ্ঠ রোধ করল তখন কবিকণ্ঠ নীরব থাকেনি।

একদিনের কথা বলে আজকের আলোচনা শেষ করব। তখন ইউরোপে যুদ্ধের আগুন সবেমাত্র জ্বলে উঠেছে, আমাদের দেশের দরজায় তা তখনও প্রবলভাবে হানা দেয় নি। একদিন সন্ধ্যায় যুদ্ধ এবং তার ফলে নানা বিপদের সম্ভাবনার কথা আলোচনা চলছিল তখন কথায় কথায় গুরুদেব বলেছিলেন, "দেখো যারা সুখে আছে, নিশ্চিন্তে আছে, যাদের আরামের শয্যা মোটা ব্যাঙ্ক ব্যালান্সের উপর পাতা তাদের মনে বিপর্যয়ের অনিশ্চয়তায় ভয় আসবে বৈকি। যে জন্য ইংরেজ এমন শান্তিবাদী হয়ে উঠেছিল। কিন্তু এমন বহু লোক আছে যারা বলে আর পারিনা। দুর্যোগ আসুক, বিপদ আসুক, তবু এ দুর্গতি আর পারিনা। কত লোক আছে যারা দিনের পর দিন অর্দ্ধাহারে আছে। এই তো সেদিন পূর্ববঙ্গের গ্রামের গল্প শুনছিলাম—শস্যশ্যামলা দেশে বাস করেও কতলোক ক্ষুদ খেয়ে কলাই সিদ্ধ খেয়ে দিন কাটায়, তোমরা কি মনে কর এই শান্তির কোনো অর্থ আছে তাদের কাছে? এই মূঢ় অসহায় দুর্বলতা যা প্রবলের ভয়ে স্তব্ধ হয়ে আছে সে কোনো শান্তি নয়। সেই

ভীরুতা শুধু প্রবলকে বল প্রয়োগ করতে প্রলুব্ধ করে, লোভীর লোভ বাড়ায়, আর দুর্বলকে করে দুর্বলতর। জানি, এই দেশেই বহুলোক আছে যারা অপেক্ষা করে আছে একটা যুগান্তকারী বিপর্যয়ের তাতে বিপদের সম্ভাবনা যতই থাকুক।" এই কথাই তিনি সেই কাছাকাছি সময়ে একজনকে একটি চিঠির উত্তরে লিখেছি.লন ঃ—

পাপের এ সঞ্চয়
সর্বনাশের পাগলের হাতে আগে হয়ে যাক ক্ষয়
বিষম দুঃখে ব্রণের পিণ্ড বিদীর্ণ হয়ে তার
কলুষ পুঞ্জ করে দিক উদ্গার।
জমা হয়েছিল আরামের লোভে দুর্বলতার রাশি
লাগুক তাহাতে লাগুক আগুন ভস্মে ফেলুক গ্রাসি।

সে কলুষ উদ্গারণ তো আজও শেষ হয়নি। লোভ শঠতা ও প্রবলের অত্যাচার দুর্বলের কণ্ঠ রোধ ক'রে বঞ্চিতের রক্ত মোক্ষণ ক'রে আজও দেশে দেশে মনুষ্যত্বকে লাঞ্ছিত করছে। যা মহৎ, যা সুন্দর, যা শ্রেষ্ঠ, যা দূরকে নিকট করতে বলে, পরকে আপন করতে বলে, সবলকে দুর্বলের প্রতি সহিষ্ণু হতে বলে, যে সত্য আছে বলে আমরা অন্যায়কে অন্যায় বলে বুঝতে পারি এবং শত আবরণ সত্ত্বেও অধর্মকে আমাদের চিনতে বিলম্ব হয় না। এবং পালন করতে পারি বা না পারি, যা আদর্শ, যা মহৎ তাকেই মানুষ বড় বলে শ্রদ্ধা করে। কবে সেই মনুষ্যত্বের চরম সত্য বিশ্বের জীবনে পূর্ণ হয়ে উঠবে তা আমরা জানিনা।

কিন্তু আজ আমাদের দেশের একটি বিপুল নবজাগরণের সূচনায় যখন শুধু বক্তৃতা মাত্র সার না ক'রে কর্মে সাধনায় ত্যাগে ও অধ্যবসায়ে আমাদের জাতীয় জীবনকে একটি অসামান্য নূতন মূর্তিতে প্রতিষ্ঠিত করবার দায়িত্ব দেশবাসী গ্রহণ করেছে, তখন সেই বিশ্ববিজয়ী মানবাত্মা, যাঁর উদ্‌ঘোষিত কণ্ঠস্বর অন্যায়ের বিরুদ্ধে বারবার বিদ্রোহ করেছে, সত্যকে আহ্বান করেছে, প্রেমকে পরিয়েছে পূজার নির্মাল্য, নূতন ভাবে, নূতন চিন্তায় মানুষকে পরিয়েছে বিজয়টিকা, মানুষের মধ্যে মনুষ্যাতীতকে যিনি জাগিয়েছেন, আমাদের দুর্ভাগ্য এই যে আজকের এই উদ্যম তাঁর উদাত্ত কণ্ঠস্বরের অভিনন্দনে অভিনন্দিত হল না। যখন কোনো সামান্য চেষ্টায়, সামান্য কাজের মধ্যেও বৃহতের ক্ষণিক প্রকাশ দেখেছেন তখন দেখেছি তার আনন্দ। এতটুকু মঙ্গল কাজকে এতটুকু সত্য প্রয়াসকে তিনি প্রলয়ান্ধকারের বিপুল মিথ্যা জড়তার চেয়ে প্রবল বলে জেনেছেন। এতটুকু আলোক শিখা যে ঘরজোড়া অন্ধকারের চেয়ে বড়ো একথা বারংবার বলেছেন। তাই আজ দুঃখের সঙ্গে মনে হয়—তাঁর দেশে কত কর্মী কত দীপালোকিত শোভাযাত্রা জয়পথে উত্তীর্ণ হবে কিন্তু তাঁর কণ্ঠস্বরে আর অভ্যর্থিত হবে না।

কিন্তু আক্ষেপোক্তিতে কাজ নেই, সমস্ত সাময়িক সমস্যার উর্দ্ধে আমাদের পরম প্রিয় যে বিদেহী আত্মা নূতন অস্তিত্বে প্রবেশ করেছেন শত কলঙ্ক সত্ত্বেও মানবজীবনের মহিমা তাঁর উপলব্ধিতে ভ্রষ্ট হয়নি।

যেখানেই যে তপস্বী করেছে দুষ্কর যজ্ঞযাগ
আমি তার লভিয়াছি ভাগ।
মোহবন্ধ মুক্ত যিনি আপনাকে করেছেন জয়
তাঁর মাঝে পেয়েছি আমার পরিচয়।
যেখানে নিঃশঙ্ক বীর মৃত্যুরে লঙ্ঘিল অনায়াসে
স্থান মোর সেই ইতিহাসে।
শ্রেষ্ঠ হতে শ্রেষ্ঠ যিনি যতবার ভুলি কেন নাম
তবু তারে করেছি প্রণাম।

প্রভাব

যেদিন তুমি আপনি ছিলে একা
আপনাকে তো হয়নি তোমার দেখা—
আমি এলেম ভাঙ্গল তোমার ঘুম
শূন্যে শূন্যে ফুটল আলোর আনন্দ কুঙ্কুম।

স্বষ্টিকর্তা মানুষের মধ্যে আপনাকে কেমন করে দেখতে চেয়েছেন, মনুষ্যত্বের কী সর্বাঙ্গীন বিকাশ, তা আমরা রবীন্দ্রনাথকে না দেখলে বুঝতে পারতাম না। যে আশ্চর্য্য দেহে তিনি আবির্ভূত হয়েছিলেন সেও এই পরম ঐশ্বর্য্যকে ধারণ করবার উপযুক্ত আধার। আশি বৎসর ধরে বিশ্বের সৃজনী শক্তি তাঁকে কেন্দ্র করে নানা কর্মে নানা রূপে আপনাকে প্রকাশ করতে করতে এসেছে। এমন ঐশ্বর্য্যময়, প্রাচুর্য্যময় উৎসরণ বিধাতা বারবার ঘটাতে পারেন নি। নদী যেমন একটি মাত্র পথ নিয়ে সুরু করলেও ক্রমে ক্রমে আপন গতির আবেগে শক্তির প্রাচুর্য্যে একটি মাত্র পথের মধ্যেই আপনাকে আর ধরে রাখতে পারে না, তেমনি একদিন কাব্যের পথে চলতে সুরু করে তারপর কত বিচিত্রধারায় তাঁর জীবন তাঁর কর্ম প্রবাহিত হয়ে

গেল। কি তাঁকে বলা না যায়—কবি, গুরু, দার্শনিক, শিল্পী, সুরস্রষ্টা, সমাজ-সংস্কারক, আরো কত কি? মানব জীবনের এমন কোন দিক আছে যা তাঁর স্পর্শলাভ করে নি? সেইজন্য তাঁর সম্বন্ধে একটা সুসম্পূর্ণ ধারণা করা ভারি কঠিন।

আমরা জানি পৃথিবীর সর্বত্র রবীন্দ্রনাথ সম্রাটের সম্মান পেয়েছেন, বিদেশীয়েরা তাঁকে অনুভব করেছে কিছুটা রচনার ভিতর দিয়ে কিছুটা তাঁর বিরাট ব্যক্তিত্বের সম্মোহনে যা ভাষার ব্যবধানকে অতিক্রম করেও মানুষের মর্ম স্পর্শ করতে পারত। দেশগত জাতিগত অসংখ্য পার্থক্য সত্ত্বেও মানুষের মধ্যের যে গভীরতম ঐক্যটি আছে, সেই ঐক্যোপলব্ধির সাধনাই তাঁর জীবনে পূর্ণ হয়ে উঠেছিল বলেই তাঁকে খুব অল্প জেনেও মানুষ তাঁর বিরাট মহত্ব এবং তাঁর মনের পরম সৌন্দর্য্য উপলব্ধি করতে পারত।

যে রবীন্দ্রনাথ বিশ্বমানব ও বিশ্বকবি বিদেশীয়েরা তাঁকেই কিছু কিছু ধারণা করতে পেরেছেন। কেউ বা তাঁকে বলেছেন—জার্মানীর গয়্‌টে যা ছিলেন রবীন্দ্রনাথ এ দেশে তাই, কেউবা সেক্সপীয়ার ওয়ার্ডসোয়ার্থ প্রভৃতির সঙ্গে তুলনা করেছেন। এই সব তুলনায় যদিও বৃহৎ রবীন্দ্রনাথের এক একটি অংশ মাত্র তুলনীয় হতে পারে। গীতাঞ্জলি, গার্ডনার, ক্রিসেণ্ট মুন, রিলিজিয়ন অফ ম্যান এই কয়েকখানা বই-এর কথাই বারবার উল্লেখ করতে দেখা যায়, তখন মনে আক্ষেপ হতে থাকে যে ভাষার ব্যবধানের জন্য কোনও দিনই রবীন্দ্রনাথ কী ছিলেন তা বোধ হয় অবাঙ্গালীর

পূর্ণরূপে জানা সম্ভব নয়, এবং বাঙ্গালীকেও জানতে হলে অনেক সাধনা ও অনেক অধ্যবসায় দিয়ে জানতে হবে।

আমাদের জীবনের সমস্তখানিই তিনি জুড়ে রয়েছেন। তাঁর চিন্তার মধ্যে তাঁর ধ্যানের মধ্যে আমাদের প্রথম জ্ঞানোন্মেষ। দেখতে শিখেই আমরা তাঁকে দেখেছি, জানতে শিখেই আমরা তাঁকে জেনেছি, তাই আমাদের জীবনে তাঁর কতখানি দান সে বিশ্লেষণ করা আমাদের পক্ষে সহজ নয়। আজ যে সমস্ত মত, যুক্তি, চিন্তা খুব স্বাভাবিক ভাবে মনে উদয় হয়, এবং অনেক সময় মনে হয় এ বুঝি আমারই চিন্তার ফল কিংবা এতো জানা কথাই, সবাই জানে, অনেক সময়ে তাঁর পুরাণো রচনা পড়তে পড়তে হঠাৎ তাদের দেখতে পাই, তখন দেখি যা আজ এত সহজ মনে হচ্ছে তা কত অধ্যবসায়, কত যুক্তি দিয়ে তাঁকে একদিন বোঝাতে হয়েছিল। এবং এ তাঁরই কথা, এ তাঁরই বাণী, আজ আমার চেতনায় প্রবেশ করে সম্পূর্ণ আমার হয়ে গেছে।

রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাবের পূর্বে এ দেশ কি ছিল তার কোনো প্রত্যক্ষ জ্ঞান আমাদের নেই বটে, কিন্তু পরোক্ষ জ্ঞান যা আছে তা থেকে জানি খুব অনুকূল আবহাওয়ার মধ্যে তাঁর আবির্ভাব হয় নি। ঈর্ষা-প্রসূত নিন্দা সমালোচনার ছদ্মবেশে বারে বারে তাঁর কর্মপথকে কণ্টকাকীর্ণ করেছে। এমন কি গত পনের কুড়ি বৎসরের কথা স্মরণ করলে আমরাও অনেক কথা লক্ষ্য করতে পারি। যখন তিনি মানসীতে লিখেছিলেন—"আমার এ লেখা

কারো ভালো লাগে তাহা কি আমার দোষ ?” তার পরেও অস্পষ্ট দুর্বোধ্য হেঁয়ালী ইত্যাদি সুচিন্তিত সমালোচনা ছাড়াও তাঁর প্রতি কাজ প্রতি পদক্ষেপ নিতান্ত ইতর লোকের দ্বারা এবং তথাকথিত শিক্ষিত লোকের দ্বারাও সমালোচিত অর্থাৎ নিন্দিত হ'তে দেখিছি। বিশেষ ক'রে তাঁর সমসাময়িকদের মধ্যে তো এই ভাবটা খুব বেশী লক্ষ্য হোতো। তাঁকে জানবার জন্য, বুঝবার জন্য, যে কোনো শিক্ষার অপেক্ষা আছে অধিকারী ভেদ আছে একথা আমাদের বাল্যাবস্থায় বিশেষ কাউকে ভাবতে দেখিনি। যারা তাঁকে ভক্তি করত সবচেয়ে তাদের হোতো দুর্দশা, কারণ লোকে হাতের কাছে তাঁকে না পেয়ে অগত্যা তাদেরই কষে দু কথা শুনিয়ে দিয়ে যেত। ‘রাবীন্দ্রিক’ কথাটা কতকটা গাল হিসাবেই ব্যবহৃত হতে শুনেছি। এই নিরন্তর প্রতিকূলতা তাঁর পেলব স্পর্শকাতর মনকে কী ভাবে আঘাত করেছে তার সঠিক ধারণা করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। যদিচ অভিমান তাঁর মনে ছিল। কিন্তু কখনো সেজন্য কোনো কাজে বিরত হয়েছেন বলে মনে হয় না। ২০।২৫ বৎসর পূর্বে যখন তিনি প্রথম নৃত্যের প্রবর্তন করেন তখনকার কথা মনে পড়ে। নিন্দা, সমালোচনা, আক্ষেপোক্তির “গেল” “গেল” রবে তখন বাঙ্গালীর মন আকুল। আজ যখন ঘরে ঘরে কন্যকারা হাত ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে নাচেন তখন কেবল তাঁর একটি কথা মনে পড়ে, “বাঙ্গালীর মেয়ের পায়ে নাচ আমি পরিয়ে যাব।” নাচের কত নাম, মাষ্টার মশায়রা জিজ্ঞাসা করেন কী নাচ শিখবে,

রাবীন্দ্রিক, দক্ষিণী, মণিপুরী না ক্ল্যাসিক্যল? মনে মনে ভাবি, বাঙ্গালীর মেয়ে তুমি যে নাচ নাচবে সবই রাবীন্দ্রিক। তিনি না হলে এই মুক্তি, এই লীলার আনন্দ তোমার দেহে এসে পৌঁছত না।

অনেকেই বলেন রবীন্দ্রনাথ যখন এসেছিলেন তখন দেশ তাঁর জন্য প্রস্তুত ছিল না। একথা বোধ হয় সব মহামানব সম্বন্ধেই অল্প বিস্তর সত্য। তাঁদের যা দেয় তা অভাবনীয় বলেই গ্রহীতাকেও তার যোগ্য করে তাঁদেরই গড়ে তুলতে হয়। সেই গড়ার কাজ আমরা রবীন্দ্রনাথের গদ্য সাহিত্যের মধ্যে বিশেষভাবে দেখতে পাই। আমাদের বেশভূষা, আচারব্যবহার, রীতিনীতি সমস্ত ব্যবহারিক সংস্কৃতির দিকে তাঁর লক্ষ্য। যে সব বিষয়ে এখন আর কিছুই মনে হয় না—যেমন সমুদ্র যাত্রা উচিত কিনা, স্ত্রীশিক্ষা, বাল্য বিবাহ, কোট-প্যাণ্ট বনাম চোগা-চাপকান ইত্যাদি থেকে সুরু করে মানবজীবনের সমস্ত স্থূল এবং সূক্ষ্ম দিকগুলি তাঁর আশ্চর্য্য নিপুণ ভাষার ভিতর দিয়ে উপমার মাধুর্য্যে মধুর হয়েও প্রবলতম যুক্তির শক্তিতে তখনকার প্রথাসর্বস্ব সমাজের মর্মে আঘাত করেছে। যে বাঙ্গালীর মেয়ে চিরদিন ঘরের আড়ালে অসাড় মনে দিন কাটাচ্ছিল তাঁর আহ্বানে সেও বহির্জগতকে জীবনকে প্রথম অনুভব করল। যে ধর্ম জীবন, কর্মজীবন ও সমাজজীবনের রূপ তিনি গড়ে তুলতে লাগলেন তা বিশেষ করে ভারতবর্ষের রূপ—যে ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ ক'রে, যে ভারতবর্ষের সভ্যতার উত্তরাধিকারী হয়েও দেশ মূঢ়ের মত

কতগুলো কুসংস্কার ও তামসিকতার নাগপাশে বদ্ধ হ'য়ে, অসাড় হয়ে পড়েছিল। আবার একদিকে কতগুলি লোক অবিশ্বাসে, অনাচারে, অনুকরণে সমস্ত বিশেষত্ব, স্বকীয়তা বিসর্জন দিচ্ছিল, যখন তারা ভুলেছিল তাঁরা কি বা কি হতে পারে, তখন তিনি ভারতীয়কে তার স্বদেশের রূপ চেনালেন। ভারতবর্ষের যথার্থ পরিচয় কি, উপনিষদের বাণী কি, ব্রাহ্মণের কি আদর্শ, কি আমাদের বিশেষত্ব, সব তাঁর ধ্যান ও মননের ভিতর দিয়ে ভারতবর্ষের চেতনাকে উদ্বুদ্ধ করতে লাগল। আমাদের দেশের প্রকৃতিগত স্বভাব কি, কোথায় আমাদের শক্তি আর কি আমাদের যথার্থ ইতিহাস, তা না জানলে "কোথা হইতে প্রাণ আকর্ষণ করিব? এরূপ অবস্থায় বিদেশকে স্বদেশের স্থানে বসাইতে আমাদের মনে দ্বিধামাত্র হয় না, ভারতবর্ষের অগৌরবে আমাদের প্রাণান্তকর লজ্জা হইতে পারে না।"

একথা তিনি শুধু লিখে বা বক্তৃতা করেই শেষ করেন নি। সারা জীবন ধরে শেখাতে চেষ্টা করেছেন। তাঁর অঙ্গে আমরা বিদেশী পোষাক দেখিনা, তাঁর গৃহে পাশ্চাত্য প্রণালী অনুসৃত হতে দেখিনা, এমনকি তাঁর ঘরের বসবার চৌকি থেকেও যেন অতীত ভারত উঁকি দেয়। কিন্তু এই যে জাতীয়তা, এই যে দেশপ্রেম তা কোনো হিংসা বিদ্বেষ বা প্রতিকূলতার বশীভূত হয়ে চালিত হয় নি। তা ভিতর থেকে আপন স্বভাবের নিয়মে বিকশিত হয়ে উঠেছে, ভারতবাসীকে ডেকে বলেছে, আপনাকে তুমি জানো। সেই জানা কেবল কতগুলো উক্তিতে নয়,

লেকচারে নয়, আমরা কি ছিলুম সেই আর্য্যামীর গোঁড়ামীতে নয়, সেই জানার দ্বারাই হওয়া। আমরা আর্য্য, আমরা আর্য্য এ কথা বলে কোনো লাভ নেই, আমরা ব্রাহ্মণ একথা বারবার বল্লেও ব্রাহ্মণত্ব লাভ হয় না, যতক্ষণ না ব্রহ্মচর্য্য পালনের দ্বারা, জ্ঞানের দ্বারা মানুষ ব্রহ্মকে উপলব্ধি করে। ভারতবর্ষের শিক্ষা কি, সাধনা কি, সমাজের মর্মকথা কি তা তিনি তেমন করেই আমাদের বোঝাতে চেয়েছেন যেমন করে বোঝার দ্বারা আমরা যথার্থ ভারতীয় হয়ে উঠতে পারি।

যদিও তিনি বিশ্বমানবকতায় বিশ্বাস করতেন, বিশ্বাস করতেন মানুষের মধ্যের গভীরতম ঐক্যে, তবুও প্রত্যেক বিশেষ মানুষকে বিশ্বের সামগ্রী বলে জেনেও, তাকে তার দেশ কালের পটভূমির উপর দেখতে চেয়েছেন।

“বিশ্বের সামগ্রী তো কাল্পনিক আকাশ-কুসুমের মতো শূন্যে ফুটিয়া থাকে না, তা দেশ কালকে আশ্রয় করে, তাহার তো নামরূপ আছে, গোলাপ ফুল তো বিশ্বেরই ধন, তাহার সুগন্ধ, তাহার সৌন্দর্য্য তো সমস্তই বিশ্বের আনন্দেরই অঙ্গ, কিন্তু তবু গোলাপ ফুল তো বিশেষভাবে গোলাপ গাছেরই ইতিহাসের সামগ্রী তা অশ্বত্থ গাছের নহে।”

তিনি স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন, “য়ুরোপীয় মানব প্রকৃতি সুদীর্ঘকালের কার্য্যে যে সভ্যতা বৃক্ষটিকে ফলবান করিয়া তুলিয়াছে তাহার দুটো একটা ফল চাহিয়া চিন্তিয়া লইতে পারি কিন্তু সমগ্র বৃক্ষটিকে আপনার করিতে পারিব না। তাহাদের

সেই অতীতকাল আমাদের অতীত। কিন্তু আমাদের ভারতবর্ষের অতীত যত্নের অভাবে যদিবা ফল দেওয়া বন্ধ করিল তবু সেই বৃহৎ অতীত ধ্বংস হয় নাই। সেই অতীতই ভিতরে থাকিয়া আমাদের পরের নকলকে বারবার অসংগত ও অকৃতকার্য্য করিয়া তুলিতেছে।"

সেই অতীতের সঙ্গে তিনি আমাদের যোগ সম্বন্ধ স্থাপন করে আমাদের বর্তমানকে সজীব ও অর্থপূর্ণ করে তুলেছেন। সে যে শুধু চিন্তা দিয়ে, যুক্তি দিয়ে তা নয়, জীবনের কর্মক্ষেত্রে প্রতিদিনের সাধনার মধ্য দিয়ে তিনি আমাদের ভারতবর্ষকে চিনিয়েছেন। যে ভারত অতীত শুধু তাকেই নয়, তার সঙ্গে যোগে বর্তমানের মধ্যে ভবিষ্যতের মধ্যে যে ভারতবর্ষকে তিনি পুনঃ আবির্ভূত করবার ভার নিয়েছিলেন তাকেও। তাঁর দৃষ্টি বৃহতের মধ্যে আবদ্ধ হয়েও ক্ষুদ্রতমকে বিস্মৃত হয় নি। তাই আজ বাংলাদেশের অখ্যাত গ্রামের মাটির প্রাঙ্গণে যে আল্পনার লেখা পড়ত পরের দিন মুছে যাবার জন্য তা সুদূর সমুদ্র পার থেকে শিক্ষাগর্বিতা শ্বেতকায়রা শিক্ষা করতে আসছেন। একজনের জীবনে এই ঘটনা ঘটিয়ে তোলা যে কি অসাধ্য সাধন তা আমরা অভ্যাসের জড়তাবশত লক্ষ্য করি না। রবীন্দ্রনাথ লেখনী হাতে নেবার পর আমাদের দেশে এমন কোনো অন্যায় অনুষ্ঠিত হয় নি যা তাঁর কণ্ঠস্বরের তীব্র ধিক্কারে জগতের সামনে লজ্জিত হয় নি। কোথায় কোন সাহেব মুহুরী মেরেছে, কোথায় কোন ইংরেজ কালোরক্ত পাত করে বেকসুর খালাস পেয়েছে,

কোথায় তিব্বত অভিযানী সাহেব কুলীদের উপর অত্যাচার করেছে, কোথায় কোন বিদেশী কাগজে ভারতীয়দের অপবাদ প্রচারিত হয়েছে, এই সমস্ত ছোট বড় সাময়িক ঘটনাকে বিচারে বিশ্লেষণে জগতের সামনে উদ্ঘাটিত করে মনুষ্যত্বের চিরন্তন মূল্য দাবী করেছেন। যাঁরা মনে করেন রবীন্দ্রনাথ 'ভাব বিলাসী' কবি তাঁরা এগুলি কি করে বিস্মৃত হন জানি না। সেই স্বপ্ন-বিলাসী স্বপ্নকে অক্ষুণ্ণ রেখেও ব্যক্তিগত সাংসারিক জীবনে সংসারের প্রতিটি খুঁটিনাটি সুবিধা অসুবিধা প্রয়োজন অপ্রয়োজন বিস্মৃত হতেন না। যাঁরা তাঁর সংস্পর্শে আসবার সুযোগ পাননি তাঁরাও তাঁর চিঠিপত্র ও অন্যান্য লেখার ভিতর দিয়ে তা জানতে পারবেন। সাধারণ গৃহীর মত তিনি অর্থ উপার্জন করেছেন, জমিদারীর হিসাব মিলিয়েছেন, পরিবারের ভার বহন করেছেন, রোগশয্যায় শুশ্রূষা করেছেন, জীবনকে তার প্রাত্যহিকতার ভার মুক্ত করে কল্পনার খেয়ায় ভাসিয়ে দেন নি। প্রতিদিনের প্রতিটি তুচ্ছ কর্মকে আনন্দে বহন করেও দৈনন্দিন তুচ্ছতার উর্দ্ধে গিয়েছেন—একথা যেমন তাঁর ব্যক্তিগত জীবন সম্বন্ধে তেমনি তাঁর জাতীয় জীবন সম্বন্ধে সত্য।

বাস্তববাদী ও আদর্শবাদী বল্লে কি বোঝায় জানি নে, কিন্তু তিনি সমস্ত বাস্তবতার ভিতর দিয়ে আদর্শকে স্পর্শ করেছেন। এটা একরকম অঘটন। জগতে বেশী কবির জীবনে ও কাব্যে আমরা এ পাইনি বলেই বাস্তববাদী ও আদর্শবাদী যেন পরপর বিরুদ্ধ কথা বলেই অনেকে মনে করেন। কিন্তু ক্ষুদ্রের ভিতর

দিয়ে যে বৃহৎকে জানা, ব্যক্তিগতর ভিতরে যে নৈর্ব্যক্তিক রসসঞ্চার, সীমার ভিতরে যে অসীমের অনুভব, বিশেষের ভিতর যে বিশ্বরূপ দর্শন, তা আমরা রবীন্দ্র কাব্যে ও জীবনে সমান-ভাবেই দেখতে পাই। তাই নিজের সন্তানের শিক্ষা দিতে গিয়ে ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের পত্তন হয় এবং নিজের জাতির মঙ্গল সাধনের প্রয়াস বিশ্বের কল্যাণে গিয়ে পৌঁছয়। ভারতী হয় বিশ্বভারতী।

তাই দেখি যখন সমাজকে তার জড়ত্বের নিগড় থেকে, কুপ্রথার বন্ধন থেকে মুক্ত করবার চেষ্টা চলেছে তখনও কি মানব জীবনের চিরন্তন সত্য তাঁর মন থেকে দূরে যেতে পেরেছে? মানুষ যে সবার পূর্বে মানুষ, অর্থাৎ তার মনুষ্যত্বই যে বড় কথা, তারপর তার জাতি, তারপর তার দেশ একথা তাঁর প্রতিটি কাজ, প্রতিটি লেখার ভিতর দেখতে পাই। দেশের মঙ্গলের অজুহাতে তাই কোনো অনাচারকে বরদাস্ত করতে হবে তিনি একথা কখনো মনে করেন নি।

"আমাদের অন্তরে এমন কে আছেন যিনি মানব অথচ ব্যক্তিগত মানবকে অতিক্রম করে 'সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ'। তিনি সর্বজনীন সর্বকালীন মানব। তাঁরই আকর্ষণে মানুষের চিন্তায়, কর্মে, ভাবে সর্বজনীনতার আবির্ভাব।

সেই মানুষের উপলব্ধিতেই মানুষ আপন জীবন সীমা অতিক্রম করে মানব সীমায় উত্তীর্ণ হয়।" তাঁর ধর্ম সাধনায় তিনি এই বিশ্বমানবের রূপকেই উপলব্ধি করতে চেয়েছেন এবং সমাজের মঙ্গলের জন্য ও ব্যক্তিবিশেষের মঙ্গলের জন্যও মানুষকে

যে তার আপন ক্ষুদ্র গণ্ডী উত্তীর্ণ হয়ে বৃহতের সঙ্গে যুক্ত হতে হবে একথা কতভাবে কতবার বলেছেন। তাই তিনি আশা করেছেন "ভারতবর্ষে বিশ্ব মানবের একটি প্রকাণ্ড সমস্যার মীমাংসা হইবে। সে সমস্যা এই যে পৃথিবীতে মানুষ বর্ণে, ভাষায়, স্বভাবে, আচরণে, ধর্মে বিচিত্র। নরদেবতা এই বিচিত্রকে লইয়াই বিরাট সেই বিচিত্রকে আমরা ভারতবর্ষের মন্দিরে একাঙ্গ করিয়া দেখিব, পার্থক্যকে নির্বাসিত বা বিলুপ্ত করিয়া নহে, কিন্তু সর্বত্র ব্রহ্মের উদার উপলব্ধির দ্বারা।"

বিশেষ করে তাঁর কবিতার মধ্যে তারই পরিচয় এসেছে যা কোনো বিশেষ সময়ের বিশেষ দেশের পক্ষেই সত্য নয়, যা সর্বদেশের সর্ব মানবের চিরন্তন আনন্দ বেদনাকেই রূপ দিয়েছে। গদ্যের মধ্যে যখন বিশ্বমানবের ঐক্য সাধনের নির্দেশ করেছেন তখন কবিতার মধ্যে সেই তত্ত্বটিই ফুটে উঠেছে রূপে, রসে, যা হয়েছে সমস্ত মানুষেরই উপলব্ধির বিষয়। তখন তাঁর সেই 'বিশ্ববীণা রবে বিশ্বজন মোহিছে'। তখন সেই গীতাঞ্জলি, ক্রিসেন্ট মুন ও গার্ডিনার প্রভৃতির ভিতব দিয়ে সমস্ত পৃথিবী ভারতবর্ষের হৃদয়ের দরজায় এসেছে। যখন রবীন্দ্রকাব্যের এই স্তরে আমরা থাকি, তখনই আমরা জানতে পারি রবীন্দ্রনাথের জাতীয়তা যথার্থ কি জিনিষ। তা শুধু সেই জাতির জন্যই নয়, তা সকলের জন্য, ভারতবর্ষকে স্বাধীন হতে হবে, মুক্ত হ'তে হবে সমস্ত তামসিকতার, পরাধীনতার বন্ধন থেকে, সে শুধু ভারতীয়দের জন্যই নয়, তা সকলেরই জন্য। অত্যাচারী যেখানে দুর্বলকে

দলিত করে সেখানে দুর্বলকে সবল হতে হবে, শুধু আত্মরক্ষার স্বার্থেই নয়, তার চেয়েও বড় স্বার্থে, অত্যাচারীকেও সে রক্ষা করবে। রবীন্দ্রনাথের দেশহিত তাই কোনো সঙ্কীর্ণ গণ্ডিবদ্ধ ছিল না। যে কল্যাণ সর্বমানবের কল্যাণ তাই তিনি কামনা করেছেন। তাই তাঁর কর্মক্ষেত্রে, সাধনার ক্ষেত্রে, ভারতের প্রাঙ্গনে বিশ্ব 'একনীড়' হয়েছে।

আমরা জানি তিনি বারবার নানা উপলক্ষ্যে বলেছেন যে তাঁর আসন গুরুর আসন নয়, তাঁর কাজ শুধু খুশী করা— "সংসার মাঝে দু'একটি সুর, রেখে দিয়ে যাব করিয়া মধুর, দু' একটি কাঁটা করি দিব দূর তারপর ছুটি নিব।" কিন্তু যে সর্বব্যাপী সার্বভৌম দৃষ্টি নিয়ে তিনি জগৎ ও জীবনকে দেখেছিলেন যে আনন্দে তিনি বিশ্বের আনন্দকে অনুভব করেছিলেন তার মধ্যে এমন কিছু ছিল যা বিশ্বকবিকে বিশ্বের গুরু করেছে। তাই ভাষার ব্যবধানের জন্য সমস্ত পৃথিবী যদিও তাঁকে পূর্ণভাবে জানেনি তবুও তাঁর আনন্দস্বরূপের স্পর্শ পেয়েছে। আনন্দের পথে শিক্ষাই কবির শিক্ষা। যেমন প্রত্যেক দিন প্রভাতে ফুলকে স্মরণ করিয়ে দিতে হয়না যে, প্রভাত হয়েছে এবার তুমি ফোট, তেমনি তাঁর কাব্যের আলো জীবনে এসে পড়লে মন আপনি জাগে। স্পষ্ট করে সে কথা জানাবার দরকারও হয় না। যা তিনি শেখাতে চেয়েছেন, বোঝাতে চেয়েছেন সবই তাঁর ভিতরের আনন্দে অনির্বচনীয় সুন্দর হয়ে প্রকাশ পেয়েছে বলেই মানুষের মনে তা গভীর প্রভাব বিস্তার করেছে। তাকে

অন্য মানুষ করে ফেলেছে। অল্প কিছুদিন পূর্বেকার কথা স্মরণ করলে অনেকেই মনে করতে পারেন যে দু' দণ্ড কথা বললেই কে রবীন্দ্রনাথের লেখা পড়েছে কে পড়েনি তা বোঝা যেত। তার সমস্ত দৃষ্টিভঙ্গীই যেত বদলে। আজকাল হয়ত একথা আর তত স্পষ্ট করে বলা চলে না কারণ তাঁর প্রভাব আরো ব্যাপক, আরো গভীর হয়ে এমন ভাবে ছড়িয়ে গেছে যে আজকালকার বাঙ্গালীর নিজেকে তাঁর থেকে আলাদা করে বোঝবার উপায় নেই। তাঁর সঙ্গে আজকের বাঙ্গালীর যে সম্বন্ধ সে কোনো বাইরের জিনিষ নয়। তিনি একজন কবিমাত্র নন, যাঁর কবিতা দু'দণ্ড বিশ্রামের সময় পড়ি, বা যাঁর নাটক অবসর কালে অভিনয় দেখে এসে ভুলে যাই। তাঁর সঙ্গে তার চিন্তার সঙ্গে তাঁর ধ্যানের রূপ তাঁর সৌন্দর্য্য দৃষ্টিতে আমাদের জীবন ধীরে ধীরে দিনে দিনে গড়ে উঠেছে। তাঁর কাছ থেকে আমরা শিক্ষা পেয়েছি, জ্ঞান পেয়েছি, রস পেয়েছি। আমাদের জীবনের প্রত্যেকটি দিনে তাঁর আনন্দময় অমৃতময় দৃষ্টি এসে পড়েছে। সুরে, ছন্দে, হাস্যে, কৌতুকে তিনি আমাদের জীবন মধুময় করেছেন, উপনিষদের বাণী নূতন করে আমাদের জীবনে এনে ভারতবর্ষের সাধনাকে উপলব্ধি করিয়েছেন। যে ভূমার সঙ্গে পরিচয়ে একদিন মানুষ মনুষ্যাতীতকে জেনেছিল—তাঁর সাধনায় আমরা আবার তার সন্ধান পেয়েছি—তাঁর কাব্যের ধ্বনিতে আমাদের হৃদয়ে কত সূক্ষ্ম অনুভূতি আনন্দ বেদনায় বেজেছে। আমাদের হৃদয়ে যে এত তন্ত্রী আছে, তাতে যে এত রাগিনী

বাজতে পারে, তা তাঁর স্পর্শেই আমরা জেনেছি। তা তাঁরই সম্বন্ধে ভাবতে গেলে আজ আর তাঁকে গুরু বলে, শিক্ষক বলে, কবি বা শিল্পী বলে, পৃথক করে ভাবতে পারিনা, তাঁকে এই দেশের প্রাণপুরুষ বলে মনে হয়। তাঁর প্রাণের স্পন্দনে তাঁর ভাবে তাঁর আনন্দরসে আমাদের জীবন ভিতর থেকে গড়ে উঠেছে তা আমরা জানি বা না জানি। স্মৃতি স্তম্ভ আমাদের গড়া হোক বা না হোক, সভা ডেকে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি বা না করি, তাঁর কাজ তো বিফল হবে না। যে আলো, যে বাতাস আমাদের প্রাণময় করেছে তাদের কথা না ভাবলেও তাদের প্রভাব নষ্ট হয় না। তিনি আমাদের যা দিয়েছেন নিজের গরজেই দিয়েছেন, গাল শুনে কি তিনি কবিতা লেখা বন্ধ করতে পারতেন? তাঁর আপন আনন্দে পূর্ণ প্রাণের প্রবাহ ভেসে এসেছে আমাদের প্লাবিত করেছে প্রাণদায়িনী নদীর মত। সেজন্য কৃতজ্ঞতা না জানাতে পারলেও ক্ষতি নেই কিন্তু সেই প্রভাবকে ব্যাহত করবার, অস্বীকার করবার কথা কেন কল্পনা করব?

তাই অত্যন্ত দ্বিধার সঙ্গে প্রশ্ন করতে ইচ্ছা করে রবীন্দ্র প্রভাব মুক্ত হওয়া কাকে বলে? এবং তা কি শুধু ভাষাকে মোচড় দিয়ে দিয়ে তার স্বাভাবিক গতি বন্ধ করলেই হবে? শুধু ভাষাতেই কি রবীন্দ্রনাথের প্রভাব? আর যদি ভাবের কথা বলা যায় কোন্ বিশেষ রকমের ভাবটা রাবীন্দ্রিক তা ধারণা করাই শক্ত। আমাদের মানসলোকের সমস্ত চেতনা, তাঁর

ভাবনা, তাঁর ধ্যানের রসে পূর্ণ হয়ে আছে। সে ক্ষেত্রে দু চারটে অন্য দেশের কথা ভরে দিলেই কি সে প্রভাব কাটবে? যখন আমাদের দেশের কাব্যর মধ্যে রোমীয় ও গ্রীক পৌরাণিক নামের উল্লেখ নানা ভঙ্গীতে দেখতে পাই তখন মনে হয় এর দ্বারাই কি রামায়ণ মহাভারতের প্রভাব আমাদের জীবন থেকে দূর হবে? সুদূর অতীত থেকে আমরা যার উত্তরাধিকারী হয়ে এসেছি—তাকে আমরা কিছুতেই পরিত্যাগ করতে পারি না। তার থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হতে পারি না। এবং তাতে লাভই বা কি? বুদ্ধদেবের আবির্ভাব তো ব্যর্থ হত, যদিনা রবীন্দ্র জীবনে তাঁর প্রভাব এসে পড়ত। আর উপনিষদের প্রভাব? রবীন্দ্র-জীবনই তো উপনিষদের প্রাণময়ী বাণী। এ বিষয়ে বোধ হয় তর্কের প্রয়োজন আর থাকছে না, যদিও এক সময়ে ঘোর তর্কজালে বাংলাদেশ মুখরিত হয়েছিল।

আমি একথা কখনই বলছিনা যে তিনি আমাদের গড়েছেন বলেই তাঁর সঙ্গে একেবারে অভেদ হতে হবে। পিতার কাছ থেকেই তো সন্তানের প্রাণ তাই বলে সেতো পিতার ছায়ানুরূপ নয়, পার্থক্য আছে। সেই পার্থক্য সেই বিশেষত্ব না থাকলে তো পুত্রের কোনো অর্থই থাকে না। কিন্তু সেই প্রভেদ কোনো কৃত্রিম উপায়ে বা জোর করে সৃষ্টি করতে হয় কি? তা যদি আপনি মূর্তি নেয় তবে তার জন্য অন্য কোনো পরিচয়-পত্র গায় আঁটতে হয় না। এবং পিতার ছায়া পুত্রের মধ্যে দেখলে লজ্জিত বা দুঃখিত হবার কোনো কারণ থাকে না। সেভাবে

দেখতে গেলে রবীন্দ্রোত্তর বলতে আমাদের বেশী দূর যেতে হয় না। রবীন্দ্রনাথ নিজেই বারবার নিজেকে উত্তীর্ণ হয়েছেন আপন প্রভাব মুক্ত হয়েছেন। মানসী-র কবির প্রভাব নবজাতকে-র কবির উপর পড়েনি। গীতাঞ্জলি-র কবি, ক্ষণিকা-র কবির অনুরূপ নয়। এই প্রভেদের বৈচিত্র্যের ভিতরই তাঁর শক্তির পূর্ণ প্রকাশ, কিন্তু তার ভিতর এক ঐক্যও আছে। সেইখানেই তার প্রাণ, সেখানেই সে জীবনের রস আহরণ করছে। তেমনি জাতির ইতিহাসে বা সাহিত্যের ইতিহাসে তার পারম্পর্য্য থেকে হঠাৎ একটা বিচ্ছেদ স্বাস্থ্যকর বা উপভোগ্য হতে পারে না। প্রভাব মুক্তির খাতিরেও নয়।

নূতন আসবেই, সেই নূতনের প্রতীক্ষায় মানুষ তো প্রতিদিন অপেক্ষা করে আছে। কিন্তু সেই নূতন তো পুরাতনের সূত্র ধরেই আসে—সেতো পুরাতনের থেকে আপনাকে ছিন্ন করেনা এবং না করলেই বা দোষ কি? লোকসান কি? রবীন্দ্রনাথ মনে করেছিলেন তাঁর কাব্যে বিহারীলালের প্রভাব পড়েছিল, তাতেও তো ক্ষতি হয় নি। দার্শনিক আর এক দার্শনিককে খণ্ডন করতে পারে। বৈজ্ঞানিক মত হয়ত একটি আর একটির দ্বারা সম্পূর্ণ খণ্ডিত হয়ে যায়, কারণ তথ্যের মধ্যে সত্য মিথ্যা ভুল ঠিক গণ্ডি কেটে পৃথক করা যায় কিন্তু যা উপলব্ধির বিষয় যা মানুষের প্রাণের মূলে রয়েছে তাকে অমন করে কাটিয়ে ওঠা যায় না, বিশেষ করে তা যদি যথার্থই কোনো গভীর, মহৎ উপলব্ধি হয়ে থাকে। যে ধর্ম যথার্থ ধর্ম, তা যেমন পৃথিবীর

নানা ধর্মমতের বিভিন্নতা সত্ত্বেও অন্তঃসলিলা হয়ে সমস্ত ধর্মের মূলেই প্রবাহিত। যে জন্য বাহ্যিক শত বৈচিত্র্য ও ব্যবহারিক পার্থক্য সত্ত্বেও ধর্মের যে মূল কথা তা সর্বত্রই এক। দেশে কালে বিচ্ছিন্ন হলেও সে ঐক্য দূর হবার নয়।

যুগে যুগে আমাদের দেশে যত মহাপুরুষ, মহাকবি আবির্ভূত হয়েছেন তাঁরা পরস্পরের দ্বারা প্রভাবান্বিত হতে লজ্জিত তো হন নি বরং গৌরব অনুভব করেছেন।

কত কবি নিজের নাম সম্পূর্ণ লুপ্ত করে কালিদাসের লেখায় নিজের লেখা জুড়ে দিয়েছেন তাতে কালিদাসের ক্ষতি হয়ে থাকতে পারে কিন্তু তাঁদের ক্ষতি হয় নি।

রামায়ণ মহাভারতে প্রক্ষিপ্ত অংশ খোঁজা তো গবেষণা, সাধ্য ব্যাপার, এ তখনকার কালের এক আশ্চর্য্য বিশেষত্ব যে তাঁরা কাজটাই রাখতে চাইতেন নামটা নয়। তাঁরা জানতেন নামের, ব্যক্তি বিশেষের, সমস্ত উপাধি নামহীন মহাকাল সমুদ্রে মিশবেই। "সোনার তরীতে" ব্যক্তি বিশেষের স্থান হওয়া অসম্ভব। তবু ফসলটা নষ্ট না হয়। তাঁদের বিনয় ছিল, তাঁরা মনে করতেন দোষ ত্রুটি ও অক্ষমতাপূর্ণ আমার এই ক্ষীণ সঞ্চয়কে মহতের সঙ্গ ধরিয়ে দিই তারা তরে যাবে, দীন যথা রাজেন্দ্র সঙ্গমে। মহতের প্রভাবে প্রভাবান্বিত হতে আমাদের দেশে কোনো কালে কোনও লজ্জা ছিল বলে জানা যায় না। দলে দলে যত নারনারী মহাপুরুষদের অনুসরণ করেছেন তাদের আদর্শকে জীবনে সার্থক করতে চেষ্টা করেছেন, তাঁরা

অনুকরণকারী বলে হেয় হন নি এবং এই ভক্তি, এই শ্রদ্ধাই তাঁদের গতানুগতিক জীবনে একটি প্রভাপূর্ণ বৈশিষ্ট্য এনেছে। চৈতন্যদেবকে অনুসরণ করেছিলেন বলে হরিদাসের প্রেম কি হীন না বৈশিষ্ট্যহীন ?

হয়ত আর একদিন রবীন্দ্রনাথের দেশে, তাঁর কাব্যের পটভূমির উপর আবার এক মহামানব মহাকবি আবির্ভূত হবেন—যদি সত্যই তিনি আসেন তবে এবার আর তাঁকে আমাদের চিনতে বিলম্ব হবে না। আমাদের চোখের ভিতর দিয়ে রবীন্দ্রনাথের চোখ, আমাদের মনের ভিতরে রবীন্দ্রনাথের মন তাঁকে অভিনন্দনে জয়মাল্য পরাবে।

যাঁর আগমনের আশায়—
"মহাকাল রহে জাগি
সেই অভাবিত অভাবনীয়ের
আবির্ভাবের লাগি।"